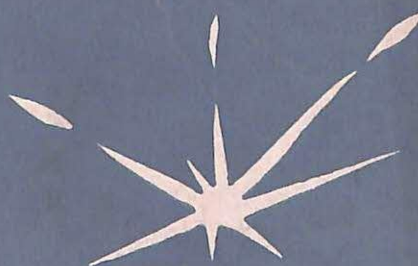
তারকা ও রাসায়নিক যুদ্ধ
এবং
আণবিক যুদ্ধের পরিণাম



ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ

তারকা ও রাসায়নিক যুদ্ধ

এবং

আণবিক যুদ্ধের পরিণাম

আনাতোলি কুন্তসেভিচ, গেন্নাডি স্টাখ,
আলেকসেই খাবারভ এবং আলেকজান্দার সৃনেগিন

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * * ১৯৮৮

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৮

মূল্য ঃ ২৫·০০

মুদ্রক ঃ
শ্রীকিঙ্করকুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

"তারকা যুদ্ধ" প্রতারণা এবং সংকট

রাসায়নিক যুদ্ধ নিষিদ্ধকরণ আবশ্যিক

এশিয়ার পক্ষে নিউক্লিয়র যুদ্ধের পরিণাম

"তারকা যুদ্ধ"
প্রতারণা এবং সংকট

মহাকাশের সামরিকীকরণঃ যুদ্ধের এক নতুন বিপদের উৎপত্তিস্থল

মহাকাশে বর্তমানে কি কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে ?

ওয়াশিংটনের রাজপুরুষেরা এবং তাদের অনুসরণ করে মার্কিন প্রচার মাধ্যম দাবি করে থাকে, মহাকাশে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তাদের অভিযোগ, মহাকাশের সামরিকীকরণ শুরু হয়েছে অনেক আগেই, যেদিন থেকে বিভিন্ন সামরিক উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাই, এ-ব্যাপারে এমন যা ঘটছে তা মূলগতভাবে নতুন কিছু নয়।

বস্তুতপক্ষে কিন্তু বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র কারোরই মহাকাশে কোন অস্ত্র নেই। যোগাযোগ, নৌচালনা, সতর্কীকরণ ও অন্যবিধ যেসব উপগ্রহ উভয় পক্ষই ব্যবহার করে থাকেন প্রকৃত অর্থে তা কোনো অস্ত্র নয়। এগুলি কোনো কিছু "ছুঁড়তে" পারে না, কাউকে হত্যা করতে পারে না। মহাকাশ থেকে সরাসরি আক্রমণের কোনো বিপদ সৃষ্টি করেনা এইসব উপগ্রহ। তারচেয়েও বড়ো কথা হল এই যে, উপগ্রহব্যবস্থা রণনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, একপক্ষের উপর আকস্মিক নিউক্লিয়র অস্ত্রাঘাত করে তাকে নিরস্ত্র করে ফেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অপরপক্ষকে। তাই সামরিক উপগ্রহের অস্তিত্ব আছে বলেই দাবী করা যায় না যে মহাকাশের সামরিকীকরণ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

মহাকাশে অবস্থিত কোনো বস্তুকে ধ্বংস করার বা মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে অবস্থিত কোনো বস্তুকে ধ্বংস করার কোনো ব্যবস্থা যদি কক্ষপথে প্রেরণ করা হয় বা মহাকাশের লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করার জন্য কোনো অস্ত্র যদি ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করা হয় তাহলে মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক এক স্তরের সূচনা হবে। মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতার সূচনা হবে তখনই।

এই বিপদের কোনো সম্ভাবনা কি বিদ্যমান ?

হ্যাঁ, বিদ্যমান। তার কারণ মহাকাশ মারফৎ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চূড়ান্ত সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে এবং পরিকল্পনা করছে। "স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ" মারফৎ ঠিক এই লক্ষ্যই হাসিল করার চেষ্টা করছে তারা। জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য যদিও "ডিফেন্সিভ"

(আত্মরক্ষামূলক) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, এই কর্মসূচীর আসল উদ্দেশ্য হল আঘাত হানতে সমর্থ এক মহাকাশ অস্ত্র উদ্ভাবন। এগুলি হবে সম্পূর্ণ নতুন এক শ্রেণীর অস্ত্র যা কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। যেমন, সমগ্র ভূগোলোকই এর আওতায় আসবে। পৃথিবীর নিকটবর্তী কোনো কক্ষপথে স্থাপিত ও নির্দিষ্ট পথে চালনার ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমন্বিত এই অস্ত্র যে কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে যে কোনো সময়ে আবির্ভূত হতে পারবে এবং তার নিরাপত্তার পক্ষে সুস্পষ্ট বিপদ সৃষ্টি করতে পারবে।

এই অস্ত্রের লক্ষ্যবস্তু মহাকাশে, আবহমণ্ডলে বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত হতে পারে। নতুন পদার্থ-তত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত এই সব মহাকাশ অস্ত্র (লেসার ও কণিকা রশ্মী অস্ত্র) খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা যায় আর প্রায় নিমেষের মধ্যেই সক্রিয় করে তোলা যায়। বস্তুতপক্ষে, মানুষের সাহায্য ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাতে এটি চলে সেভাবেই এই অস্ত্র তৈরি। আর এই কারণেই এ-অস্ত্র আরও বেশী বিপজ্জনক। বর্তমানে, বিদ্যমান অস্ত্র-ব্যবস্থায় পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য তবু কিছুটা সময় পাওয়া যায় এবং শোচনীয় ঘটনা এড়ান যায়, কিন্তু মহাকাশ অস্ত্রের যুদ্ধ আকস্মিকভাবে বেধে যেতে পারে।

পশ্চিমী প্রচারে দাবি করা হয়ে থাকে স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ (তারকা যুদ্ধ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সারা বিশ্বের নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি। সত্যের সঙ্গে এই প্রচারের কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে নিউক্লিয়র যুদ্ধে নিরঙ্কুশভাবে নির্ভরযোগ্য কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই এবং এরকম কিছু সৃষ্টি করা বস্তুতপক্ষে অসম্ভব। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান আকাদেমির দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা, বিশেষ করে আমেরিকার ন্যাশনাল আকাদেমি, গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটি, ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অব সায়েন্সেস ও সোভিয়েত জাতি-সংঘের আকাদেমি অব সায়েন্সেসের প্রতিনিধিরা এই সত্যেরই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মহাকাশ সামরিকীকরণের মার্কিন পরিকল্পনা যদি কার্যে পরিণত করা হয় তাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে না বা যুক্তরাষ্ট্রও অধিকতর শক্তিশালী হবে না। কেননা সেক্ষেত্রে অন্যপক্ষও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। জবাবে তারাও উপযুক্ত পাল্টা অস্ত্র তৈরি করবে আর তার ফলে সর্বক্ষেত্রেই অস্ত্র প্রতিযোগিতার তুঙ্গীকরণ ঘটবে।

আঘাত হানার মহাকাশ অস্ত্র আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে পারে না। এতে বরং উল্টো ফলই ফলবেঃ নিউক্লিয়র যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা বাড়বে। আকস্মিকভাবে এই ধরনের যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনাও আরও প্রবল হবে। মার্কিন নিউক্লিয়র অস্ত্রঘটিত অনেক দুর্ঘটনার খবর বিশ্বে সুবিদিত, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যান্ত্রিক গোলোযোগের কারণে মিথ্যা বিপদসংকেতের ঘটনাও ঘটেছে। মহাকাশ

আঘাত হানার অস্ত্র দিয়ে ঠাসা থাকলে এই ধরনের ভ্রান্তি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

প্রলয় এড়াবার জন্যে আগেভাগেই সমঝওতা করে আক্রমণাত্মক মহাকাশ অস্ত্রের বিকাশ (গবেষণা সহ), তার পরীক্ষা ও কক্ষপথে স্থাপন নিষিদ্ধ করাই কি অনেক বুদ্ধিমানের কাজ নয় ?

আজ মানবজাতির সামনে যে প্রশ্ন সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল— মহাকাশে শান্তি না শান্তি নয় ? আর এই প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দোষে নয়। শুধু আক্রমণের জন্যেই কাজে লাগে এরূপ মহাকাশ অস্ত্র সৃষ্টির কাজে হাত দিয়ে হোয়াইট হাউসই এই প্রশ্নটিকে বিশ্ব রাজনীতির কর্মসূচীর তালিকাভুক্ত করেছে।

"তারকা যুদ্ধে"র কর্মসূচী যদি অব্যাহত রাখা হয় তাহলে মহাকাশ অস্ত্রের আবির্ভাব ঘটবেই। তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে অস্ত্রপ্রতিযোগিতায় মানবসমাজ বিপদসীমা অতিক্রম করে যাবে, যেখান থেকে ফেরার পথ থাকবে না। সেই কারণেই মহাকাশে আক্রমণাত্মক অস্ত্রস্থাপন রোধ করা যাবে কিনা, মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ করা যাবে কিনা এই প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপরই নির্ভর করছে বিশ্বের সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন্ পথ ধরে এগোবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ত্রমুক্ত মহাকাশের পক্ষে

মহাকাশ যুগের একেবারে গোড়ার দিনগুলি থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা অবিচল ভাবে বলে আসছে।

পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপনের অল্পকাল পরেই (অক্টোবর ১৯৫৭) ১৯৫৮ সালের ১৫ মে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত এক স্মারকলিপিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হোক এবং এতে কোনো ব্যতিক্রম করা চলবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। স্পষ্টতই তারা সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশকে ব্যবহারের পথ খোলা রাখতে চেয়েছিল। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অন্য কয়েকটি দেশের অধ্যবসায়ী প্রয়াসের ফলে কতকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহাকাশের সামরিকীকরণের পথে কিছু প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হল ১৯৬৭ সালের চন্দ্র ও অন্যান্য আকাশের বস্তু সহ মহাকাশ গবেষণা ও ব্যবহারের ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের নীতি সংক্রান্ত চুক্তি এবং ১৯৭২ সালে সম্পাদিত বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সীমিতকরণ সংক্রান্ত (এবিএম চুক্তি) সোভিয়েত-মার্কিন চুক্তি।

প্রথমোক্ত চুক্তি অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্র নিউক্লিয়ার বা অন্য কোনো গণবিধ্বংসী অস্ত্রবাহী কোনা বস্তু পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করতে পারবে না, বা আকাশের কোনো বস্তু বা স্টেশনে বা অন্যকোনো উপায়ে মহাকাশে স্থাপন করতে পারবে না, আর শেষোক্ত চুক্তিবলে স্বাক্ষরকারী দেশ নিজের অঞ্চলের প্রতিরক্ষার জন্য এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তুলবে না বা অন্য কাউকে তাদের দেশে এ-উদ্দেশ্যে ঘাঁটি করতে দেবে না বা মহাকাশ ভিত্তিক কোনো এবিএম ব্যবস্থা বা তার অংশবিশেষ গড়ে তুলবে না। তবে বর্তমানে যেসব চুক্তি বলবৎ আছে তা মহাকাশে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা শুরু করার সব পথ বন্ধ করে দেয় না।

সেই কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করেছে মহাকাশে যেকোনো প্রকার অস্ত্র স্থাপন নিষিদ্ধ করা হোক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি চুক্তির খসড়া ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রসংঘে পেশ করেছে। ১৯৮৩ সালে আরো একটু অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে এবং মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে বলের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেয়। রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৮তম অধিবেশনে (১৯৮৩)

সে এ-সংক্রান্ত একটি চুক্তির খসড়াও পেশ করে। এই খসড়ায় রাষ্ট্রগুলি মহাকাশে এবং মহাকাশ থেকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বলের ব্যবহার না করার রাজনৈতিক-আইনগত অঙ্গীকার বিধিবদ্ধ ছিল এবং ছিল মহাকাশ সামরিকীকরণরোধক ব্যবস্থা। চুক্তির খসড়ায় ছিল পৃথিবী, আকাশ ও মহাকাশে কোনো লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানার মতো কোনো অস্ত্র মহাকাশে স্থাপনের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা। উপগ্রহ-বিরোধী অস্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক বৈপ্লবিক সমাধানের প্রস্তাব করে—এই ধরনের নতুন কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস ত্যাগ করা, উভয় পক্ষে এখন এ-ধরনের যেসব অস্ত্র আছে তা ধ্বংস করা এবং সামরিক উদ্দেশ্যে যাত্রীবাহী মহাকাশ যান ব্যবহার করা বা এ-সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা।

সোভিয়েত সরকার একই সঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে: সোভিয়েত ইউনিয়ন এককভাবে অঙ্গীকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে কোনো উপগ্রহবিরোধী অস্ত্র স্থাপন করবে না, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যেরা এ-কাজ থেকে বিরত থাকে। যুক্তরাষ্ট্র এই সব সোভিয়েত শান্তি উদ্যোগের বিরোধিতা করে।

তবু, মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা এড়াতে চায় বলে সোভিয়েত সরকার ১৯৮৪ সালের ২৯জুন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে প্রস্তাব দেয় মহাকাশের সামরিকীকরণ বন্ধ করার জন্য ১৯৮৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনা শুরু করা হোক। সোভিয়েত প্রস্তাবে বলা হয় মহাকাশে যেকোনো প্রকার অস্ত্র স্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক—তা সে প্রচলিত অস্ত্রই হোক বা নিউক্লিয়র, লেসার, কণিকা রশ্মী বা অন্য কোনো অস্ত্র, যাত্রীবাহী বা যাত্রীবিহীন ব্যবস্থায় যেন স্থাপন না করা হয়। ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা উপগ্রহবিরোধী ব্যবস্থার জন্য বা ভূপৃষ্ঠ কিংবা আবহমণ্ডলের কোনো লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানার জন্য এই ধরনের অস্ত্র নির্মাণ, পরীক্ষা বা তা স্থাপন করা যেন না হয়। এই ধরনের যেসব অস্ত্র ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা যেন ধ্বংস করা হয়।

এক পরিবারভুক্ত এই ধরনের সকল অস্ত্র, মহাকাশ থেকে আঘাত হানার সকল অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং তার বিনষ্টীকরণের এই প্রস্তাবের অঙ্গীভূত ছিল প্রধানত জাতীয় প্রাযুক্তিক উপায়ে চুক্তি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখার ও নিয়ন্ত্রণ করার সংশ্লিষ্টপক্ষের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা। অস্বচ্ছ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তথ্য বিনিময় করবে এবং আলোচনায় বসবে। প্রয়োজন হলে যাচাইয়ের অন্য ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করা যাবে।

চুক্তির অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য এবং মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা রোধের বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যেদিন থেকে

আলোচনা শুরু হবে সেই দিন থেকে পারস্পরিক ভিত্তিতে মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র পরীক্ষা এবং স্থাপনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোক।

১৯৮৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে আলোচনা শুরু করার সোভিয়েত প্রস্তাব যদি যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করতো তাহলে যুদ্ধের বিপদ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হত। **প্রথমত**, আলোচনা শুরু হওয়ার দিন থেকে মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র স্থাপনের উপর পারস্পরিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হত। এই একটি ঘটনাই অগ্রগতির এক বড়ো পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হত ; দেখিয়ে দিত উভয়-পক্ষই রণনৈতিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করা এবং যুদ্ধের বিপদ হ্রাস করার আদর্শের প্রতি অনুগত। **দ্বিতীয়ত**, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি মহাকাশে আঘাত হানার সমস্ত অস্ত্র নিষিদ্ধ করার চুক্তির পথ রচনায় নিযুক্ত হত। এই ধরনের চুক্তির ফল পরিণামে মহাকাশ শান্তির এলাকাই থাকত—হয়ে উঠত সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, ভিন্ন সামাজিক অবস্থা বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র।

পরিতাপের বিষয়, সোভিয়েত প্রস্তাবে যে সম্ভাবনা ছিল ওয়াশিংটনের মনোভাবের ফলে তার সদ্ব্যবহার করা গেল না। মহাকাশের সামরিকীকরণ এড়াবার জন্য আলোচনা শুরু করার যে প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৪ সালে দিয়েছিল তা যাতে অনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য মার্কিন নীতিনির্ধারকরা সব কিছু করেছিল। ১৯৮৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে ঃ তারা প্রস্তাব করে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৯তম অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী প্রশ্ন হিসেবে একমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্যই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহারের প্রশ্নটি আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ ভোটে (১৫০টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়) রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ মহাকাশে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা রোধ করার জন্য যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে তাতে সোভিয়েত প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য ও সারমর্মই প্রতিফলিত হয়। একমাত্র যে দেশটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় নি, ভোটদানে বিরত ছিল, সে-দেশটি হল যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিউক্লিয়র ও মহাকাশ অস্ত্র সম্পর্কে নূতন আলোচনা শুরু করে। ১৯৮৫ সালের ৮ জানুয়ারি জেনিভায় প্রকাশিত এক সোভিয়েত-মার্কিন বিবৃতি অনুসারে আলোচনার বিষয় ছিল মহাকাশ ও স্ট্রাটেজিক ও মাঝারি পাল্লা উভয় ধরনের নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রভৃতি প্রশ্নের সমাহার, যে প্রশ্নগুলিই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ধরে বিবেচিত এবং মীমাংসিত হবে। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা পরিহার করা। এর গুরুত্ব ছিল মৌলিক, কেননা এর ফলে পৃথিবীতে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করার সুযোগ পাওয়া যেত এবং মজুত নিউক্লিয়র অস্ত্রভাণ্ডার কমান যেত।

এই সব ব্যবস্থাগুলিকে একটি সমাহার হিসেবে গ্রহণ করলে তবেই সত্যিকারের রণনৈতিক স্থিতিশীলতা শক্তিশালী হবে এবং শেষ পর্যন্ত সর্বত্র সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র বিনষ্ট করে ফেলার পথ প্রশস্ত হবে।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নিউক্লিয়র ও মহাকাশ অস্ত্র নিয়ে জেনিভা আলোচনার তাই হল ভিত্তি। একমাত্র এখান থেকে যাত্রা করলে তবেই সাফল্য আসতে পারে। তাই চুক্তির সব কটি শর্ত কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

সোভিয়েত পক্ষ ঠিক এই কাজটিই করছে, সুস্পষ্ট প্রস্তাব দিয়ে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে সমর্থন করছে। আলোচনার মূল বিষয়, মহাকাশ অস্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েত প্রস্তাব হল এই অস্ত্র তৈরী করা (গবেষণাসহ), পরীক্ষা করা এবং মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র স্থাপন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হোক। যেসব উপগ্রহ বিরোধী মার্কিন ও সোভিয়েত অস্ত্র এখনই আছে, যার পরীক্ষা এখনও হয় নি, তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

যেহেতু দু' পক্ষ আলোচনায় বসছে অস্ত্র হ্রাসের জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে তাদের অন্তত এটা দেখা দরকার যাতে অস্ত্র বৃদ্ধি না হয়। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে উভয় পক্ষেই যতদিন আলোচনা চলবে ততদিন মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র তৈরী (গবেষণাসহ) করা, তার পরীক্ষা করা এবং মহাকাশে তা স্থাপন করার উপর স্থগিতাদেশ দেবে এবং স্ট্রাটেজিক আঘাত হানার অস্ত্র যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় রাখবে। ইওরোপে মার্কিন মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তার পাল্টা ব্যবস্থা গড়ে তোলা একই সঙ্গে স্থগিত করতে হবে। তার আন্তরিকতা এবং সদিচ্ছা প্রদর্শনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন একতরফাভাবে ঘোষণা করে ৭ এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ইউরোপে মাঝারি পাল্লার কোনো ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করবে না বা সেখানে অন্য কোনো রকম পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া স্থগিত রাখবে। এর দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার একবার দেখিয়ে দিল কথায় নয় কাজেই অতি দ্রুত অস্ত্রপ্রতিযোগিতা রোধের জন্য কাজ করতে আগ্রহী।

জেনিভা আলোচনায় যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বৈপ্লবিক সমাধানের পক্ষে—সে প্রস্তাব করেছে সব ধরনের মহাকাশ অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হোক যাতে গবেষণা ও পরীক্ষা সহ তার নির্মাণ বন্ধ হয়। এ ধরনের যেসব অস্ত্র এখন আছে অবশ্যই তাকে বিনষ্ট করতে হবে যাতে উভয় পক্ষই বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে মহাকাশ থেকে আক্রমণ হানার অস্ত্র নির্মাণ ও তার উন্নতিসাধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচোভ বলেছেন, "মহাকাশ সমগ্র মানবজাতির

সাধারণ সম্পত্তি, তা কখনই যেন সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে না ওঠে। যদি মহাকাশের সামরিকীকরণ না হয় তাহলে স্ট্রাটেজিক নিউক্লিয়র অস্ত্র এবং ইউরোপে মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবস্থার অনেকটাই হ্রাস পাবে। নিউক্লিয়র অস্ত্রের বড়ো রকমের হ্রাসের উপায় এবং তার ধ্বংসের ফল পরিণাম হিসেবে প্রয়োজন হল মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণ এবং তা স্থাপনের উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারী করার আহ্বান জানান।

জেনিভায় সোভিয়েত-আমেরিকান আলাপ-আলোচনা মানবজাতিকে অস্ত্র-প্রতিযোগিতার আরও তুঙ্গীকরণ থেকে মুক্তি দেবার সুযোগ এনে দিতে পারে। এই সুযোগ কখনই হারানো উচিত নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান মতিগতি কি? খুবই যুক্তিসংগত প্রশ্ন। কেননা আলোচনা সফল হতে গেলে, শুধু এক পক্ষের নয়, দু পক্ষেরই শুভেচ্ছা প্রয়োজন।

আলোচনায় কেন্দ্রীয় ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় ছিল মহাকাশে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা রোধ করা কিন্তু আমেরিকান পক্ষ এমন ভাব করছে মহাকাশে অস্ত্রের ব্যাপারটি যেন কখনই এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রকাশ্যে এবং আলোচনার সময় মার্কিন মুখপাত্র পরিস্কার ভাষাতেই বলেন যুক্তরাষ্ট্র "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী চালিয়ে যাবেই, অর্থাৎ সে তার মহাকাশ অস্ত্র কর্মসূচী চালিয়ে যাবেই তাতে যা হয় হবে।

তাহলে মহাকাশ অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ করার উপায় কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে স্রেফ নিয়ন্ত্রণের "নিয়ম" বেধে দিলেই (অর্থাৎ কোন্ কোন্ আঘাত হানার অস্ত্র স্থাপন করা হবে, কত সংখ্যায় এবং কোন্ সময়ের মধ্যে) হল, তাহলে আর প্রতিযোগিতা হবে না। প্রেসিডেন্ট রেগনের "নির্দেশাবলী", দেখাই যাচ্ছে, এখনও বলবৎ আছে। তিনি বলেন, "যদি কোনো যুক্তি দিতে হয় তা হবে কোন্ অস্ত্র তাই নিয়ে, কোনো সন্ধি বা চুক্তির জন্য কোন্ অস্ত্র পরিত্যাগ করা দরকার তা নিয়ে নয়।"

ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টতই মহাকাশে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা সমস্যার যেকোনো সম্ভাব্য সমাধানকে নস্যাৎ করা। তথাকথিত স্ট্রাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ, যা আসলে অতি দ্রুত মহাকাশ সামরিকীকরণেরই কর্মসূচী, যেনতেন প্রকারেণ তাকে রূপায়িত করা ও তাকে আইনসম্মত করা। তবে এর জন্যে যে মূল্য দিতে হবে তা শুধু জেনিভা আলোচনাকে বানচাল করাই নয়, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা রোধের সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ মহাকাশ মারফৎ সামরিক প্রাধান্য

তাদের প্রতিনিধিদের কথায় বারংবার এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে রেগন প্রশাসন মহাকাশের সামরিকীকরণে বদ্ধপরিকর। হোয়াইট হাউস মনে করে মহাকাশ হল এমন একটা "নিরঙ্কুশ অবস্থান" যাকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারলে বিশ্বে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশের সামরিকীকরণের উপর এতটা নির্ভশীল কেন ? এর প্রধান কারণ সে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির উপর মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণ করে চূড়ান্ত সামরিক প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। ঘটনাটা হল এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল তা থেকে তাদের আশানুরূপ ফয়দা তোলা যায় নি। যুক্তরাষ্ট্র যে সব অতিবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার কোনোটিই তাকে সামরিক প্রাধান্য এনে দেয়নি। এই ধরনের অস্ত্রসজ্জা প্রতিবারেই উপযুক্ত সোভিয়েত সাড়া ডেকে এনেছে।

বছরের পর বছর ধরে মার্কিন সামরিক নীতি একটা দুষ্টচক্রে আবর্তিত হয়েছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুক্তরাষ্ট্র বা তার মিত্রদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে না। নিউক্লিয়র যুদ্ধে জয়লাভের আশা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কেননা এর অনিবার্য পরিণাম নিউক্লিয়র প্রতিশোধ।

এ-থেকে একমাত্র যুক্তিসম্মত যে-সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে, মনে হয়, তাহল নিউক্লিয়র অস্ত্রাগার গড়ে তোলা বন্ধ করা এবং তার চূড়ান্ত ধ্বংসসাধনের জন্য, বড়ো রকমের হ্রাসের জন্য চুক্তিতে উপনীত হওয়া। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলা যায়, ১৯৪৬ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ লক্ষ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে ও সুসঙ্গতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, 'শক্তির অবস্থান' থেকে এগোবার রীতি নয়, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার নীতিই হওয়া উচিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু।

কিন্তু মার্কিন সামরিক চক্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ এবং যুক্তিও অন্য প্রকারের। যে নতুন ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করবে বলে স্থির করেছে তা হল মহাকাশ। তারা চাইছে মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র তৈরি করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পিছনে ফেলে দিতে। মার্কিন রণনীতি বিশারদদের ধারণা, এর ফলে সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য কমে যাবে।

অনেকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য মহাকাশের সামরিকীকরণ। মহাকাশ যুগের একেবারে গোড়া থেকেই তারা মহাকাশের পৃথিবীর নিকটতম অংশকে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করার মঞ্চ হিসেবে দেখে আসছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আরও অনেক সাক্ষ্যের সঙ্গে 'পেণ্টাগন পেপারস' থেকে। এই দলিলগুলি সম্প্রতিকালে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই দলিল থেকে দেখা যায় সেই ১৯৫৬ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপগ্রহবিরোধী অস্ত্র ব্যবহারের ধারণার বিশদীকরণ করছে। উপগ্রহবিরোধী অস্ত্রব্যবস্থার বিকাশ ঘটাবার প্রথম পরিকল্পনা, যার সাংকেতিক নাম ছিল 'সেইণ্ট' (**SAINT**), ১৯৫৯ সালেই মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে পেশ করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম দেশ যে উপগ্রহবিধ্বংসী অস্ত্র পরীক্ষা করে। ১৯৫৯ সালে বি-৪৭ বোমারু বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত একটি ক্ষেপণাস্ত্র 'এক্সপ্লোরার-৬' উপগ্রহকে আঘাত করে। ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রই প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে দুটি উপগ্রহবিরোধী ব্যবস্থা স্থাপন করে—একটি ১৯৬৩ সালে কআজালেন প্রবাল দ্বীপে এবং অপরটি ১৯৬৪ সালে জনস্টন দ্বীপে। প্রথমটি নিক-জিউস (**NIKE-ZEUS**) ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থার ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়টি সংশোধিত থর-এগেনা (**THOR-AGENA**) ক্ষেপনাস্ত্র। সেই সময় লক্ষ্য-উপগ্রহসমূহকে আঘাত হানার জন্য বহুসংখ্যক ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ সামরিকীকরণের দিকে একান্তভাবে ঝুঁকে পড়েছে। মহাকাশ সংক্রান্ত সামরিক কর্মসূচীর জন্য ক্রমবর্ধমান ব্যয়বরাদ্দ থেকেই এটা প্রকাশ পায়। ১৯৮৩ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮·৫ বিলিয়ন ডলার এবং ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে যথাক্রমে ৯·৩ বিলিয়ন ডলার ও ১২·৯ বিলিয়ন ডলার। মহাকাশ সামরিকীকরণ কর্মসূচীর জন্য ব্যয়বরাদ্দ ১৯৮৮ সালে বেড়ে ২০ বিলিয়ান ডলার হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাই এ-ব্যাপারে প্রকৃত ব্যয় আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে সবার আগে মহাকাশভিত্তিক উপগ্রহবিধ্বংসী ও ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী অস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণার উপর। যেমন, এফ-১৫ জঙ্গী বিমান ভিত্তিক আকাশ থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য অ্যাসাট (**ASAT**) (উপগ্রহবিধ্বংসী) ব্যবস্থা, এখন পুরোদস্তুর পরীক্ষার স্তরে রয়েছে। মনুষ্যবাহী মহাকাশ শাটল-এর জন্য নানা ধরনের অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে যা মহাকাশে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানতে পারে আর তা ক্রমশঃ প্রকাশ্যেই সামরিক ব্যবহারের দিকে চালিত হচ্ছে। পৃথিবী ও মহাকাশ মঞ্চ বা বৃহদাকার পরিবহন বিমান থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য যাত্রীবাহী বা যাত্রীশূন্য উপগ্রহ পেণ্টগণের আদেশক্রমে উৎপন্ন করা হচ্ছে।

৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সামরিক উদ্দেশ্যসাধক কক্ষপথে স্থাপনযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী স্টেশন নির্মাণের ১১ বিলিয়ন ডলারের নাসা (NASA) কর্মসূচী মার্কিন প্রশাসন ১৯৮৪ সালে অনুমোদন করেছে। সারা দুনিয়া জুড়ে নজরদারি এবং সশস্ত্রবাহিনীর কম্যাণ্ড ও কন্ট্রোলের ব্যবস্থাদি স্থাপিত হবে এইসব স্টেশনে।

কোনো রকম ছদ্ম-আবরণের তোয়াক্কা না করে প্রবলভাবে মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯৮৩ সালের ২৩শে মার্চ প্রেসিডেণ্ট রেগন কর্তৃক "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী ঘোষণার পর থেকে। ১৯৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারির ১১৯ নং নির্দেশ (প্রেসিডেণ্টের স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ) এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মার্কিন জাতীয় নীতিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় মহাকাশের সামরিকীকরণের উপর।

এই তথাকথিত 'স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ' ব্যাপারটা কি ? প্রকল্প রচয়িতাদের কল্পনা অনুসারে এর লক্ষ্য একটি "ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী মহাকাশ বর্ম" গড়ে তোলা যা শত্রুর অতি-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে রক্ষা করবে ঐ ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে উড্ডয়নের বিভিন্ন স্তরে বিনষ্ট করে। এই "বর্ম" গঠিত হবে তিন বা ততোধিক স্তরের ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা যার কিছুটা থাকবে মহাকাশে আর কিছুটা ভূপৃষ্ঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সামগ্রিক ব্যবস্থাটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছে তার কেন্দ্রে থাকবে পদার্থবিদ্যার নতুন তত্ত্বর ভিত্তিতে নির্মিত মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র—যেমন, বিভিন্ন ধরনের রশ্মীজনিত অস্ত্র, কণিকা ত্বরণ ও বৈদ্যুত-চুম্বক বন্দুক এবং ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী অস্ত্র। পেণ্টাগণের রণনীতিবিদরা ধরে নিয়েছেন পরপর কয়েকটি স্তরে এইসব মহাকাশ, আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ-ভিত্তিক অস্ত্র স্থাপন করতে পারলে শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের একটা "বিশ্বস্ত" ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।

এই ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা মহাকাশ প্রতিরক্ষা স্তরের। প্রকল্প রচয়িতারা মনে করেন এই স্তরের অস্ত্রগুলি বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করবে ঃ প্রতিশোধ নেবার জন্য যে আন্তর্মহাদেশীয় বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হবে তা সোভিয়েত ভূখণ্ডে উড্ডীয়মান অবস্থাতেই ধ্বংস করা হবে, অর্থাৎ, তার উড্ডয়নের উৎক্ষেপণ পর্যায়ে (৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায়), পুনঃপ্রবেশ যানে স্থাপনের পূর্বেই ধ্বংস করা হবে। প্রথম স্তরের অন্তর্গত থাকবে লক্ষ্যে চালিত শক্তি অস্ত্র ঃ রাসায়নিক ও এক্স-রে লেসার এবং কণিকা ত্বরণ (কণিকা রশ্মী অস্ত্র) অস্ত্র। এই অস্ত্রগুলি স্থাপিত হবে শত শত মহাকাশ স্টেশনে (মঞ্চে) আর এতে যুক্ত হবে অপটিক্যাল ফোকাসিং ব্যবস্থা এবং লেসার বা কণিকা রশ্মী নির্দেশক ব্যবস্থা। হিসেব করা হয়েছে যে উৎক্ষেপণের ২ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে শত্রুপক্ষের আই-সি-বি-এমগুলি অকেজো করে ফেলা যাবে।

মহাকাশভিত্তিক দ্বিতীয় স্তরের ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অস্ত্রগুলি তখন সক্রিয় হবে এবং যে সব আই সি বি এম ও নিউক্লিয়র অস্ত্রের ফলক তখনও বিনষ্ট হয় নি, কক্ষপথের মধ্য পর্যায়ে রয়েছে, তার মোকাবিলা করবে। এই দ্বিতীয় স্তরে থাকবে তড়িৎ-চুম্বক বন্দুক এবং উপগ্রহসমূহ যাতে থাকবে লক্ষ্যে আঘাত হানার মতো দৃঢ়সংবদ্ধ ক্ষেপণাস্ত্র। বিশেষজ্ঞদের ধারণা তড়িৎ-চুম্বক বন্দুক তাদের গ্রাফের (**projectile**) গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে কয়েক ডজন কিলোমিটারে ত্বরণে সমর্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন সব প্রকল্প রয়েছে যাতে পৃথিবীর নিকটস্থ কক্ষপথে আকাশে ৫০০ উপগ্রহ স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি উপগ্রহে থাকবে ৪০ থেকে ৫০ টি বাধাদানকারী ক্ষেপণাস্ত্র, নির্মাতাদের ধারণা উৎক্ষেপণ এবং উড্ডয়নের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তা লক্ষ্যবস্তুকে অকেজো করে দেবে।

উড্ডয়নের অন্তিম পর্বে, ১০০—৮০০ কি.মি. থেকে ৯—১৫ কি.মি. উচ্চতায়, তৃতীয় স্তর দূর ও নিকট পাল্লার ভূপৃষ্ঠ ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র এসে পড়বে। এই ধরনের কিছু অস্ত্র ইতিমধ্যেই উড্ডয়ন পরীক্ষার স্তরে রয়েছে। উদাহরণত, ১৯৮৪ সালের জুন মাসে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যভাগে ১৬০ কিমি উচ্চতায় মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী অস্ত্র আইসিবিএমের অস্ত্রফলকে আঘাত হানে।

মহাকাশ থেকে আঘাত হানার সমস্ত মার্কিন অস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে একটি সর্বার্থসাধক দ্রুতগতি দুনিয়াজোড়া নজরদারি ব্যবস্থা। এর কাজ হবে কোথায় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ হচ্ছে তার উপর নজর রাখা, ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ হিসাব করা, অস্ত্রফলক চিহ্নিত করা এবং তাকে অনুসরণ করা এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র বেছে নেওয়া।

এই হল মার্কিন পরিকল্পনা যাকে প্রচার করা হয় 'স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ' বলে। এই 'ইনিসিয়েটিভ' অনেকের কাছে "নির্দোষ" বলে মনে হতে পারে, এমনকি প্রথম দর্শনে "আকর্ষক" বলেও প্রতিভাত হতে পারে কেননা তার লক্ষ্য নাকি "প্রতিরক্ষা" কিন্তু আসলে তা বিপজ্জনক মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতিরই মুখ্য উপাদান যার লক্ষ্য হল মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র উদ্ভাবন এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিউক্লিয়ার আঘাত হানার ক্ষমতার অতুচ্চ বৃদ্ধি। এই সব পরিকল্পনার লক্ষ্য হল ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী একটি বর্মের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে মহাকাশভিত্তিক নতুন স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র স্থাপন যার উদ্দেশ্য হবে ভূপৃষ্ঠে, আকাশে এবং মহাকাশে লক্ষ্যবস্তু বিনষ্ট করা। এই পরিকল্পনার পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছে তাহল "দেশ জোড়া" এবিএম ব্যবস্থার সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা ক্ষমতার মূল্যহ্রাস করা এবং একই সঙ্গে মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। অন্য কথায়, এর অর্থ হল বর্তমানে যে স্ট্র্যাটেজিক

ভারসাম্য রয়েছে তাকে বিনষ্ট করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির উপর নিয়ামক সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। আগেই বলা হয়েছে শান্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এর ফল পরিণাম হবে বিপর্যয়কর।

১৯৮৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আকাশ-মহাকাশ সম্পর্কে (**Aerospace Doctrine**) যে তত্ত্ব প্রকাশ্যে প্রতিপাদন করেছে তাহল মহাকাশ অস্ত্র বিমান-বাহিনীর হাতে থাকবে আর তাদের দায়িত্ব হবে মহাকাশে মার্কিন প্রাধান্য বিস্তার করা যা আমেরিকার "দীর্ঘায়ত লড়াই চালাবার ক্ষমতা" নিশ্চিত করবে, কার্যকর স্ট্রাটেজিক আঘাত হানতে সে সমর্থ হবে এবং "সামরিক অভিযান চালাবার সীমাহীন সামর্থ্য এবং সুযোগ" তার করায়ত্ত হবে।

মার্কিন "স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ"— ঢাল না তলোয়ার?

মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র ব্যবস্থাটি যা নিয়ে এত কথা হচ্ছে আসলে তা এক "প্রতিরক্ষামূলক" ব্যবস্থা—বিশ্বজনমতকে এই কথাটা বোঝাবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করছে না মার্কিন প্রশাসন। তারা বোঝাতে চাইছে আসলে এটা একটা ঢাল—তলোয়ার নয়। কিন্তু একটু ভালো করে খতিয়ে দেখলেই দেখা যায়, "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী প্রতিরক্ষামূলক চরিত্রের বলে যে প্রচার চালান হচ্ছে সেটা বস্তুত-পক্ষে একটি ধূম্রজাল মাত্র যার আড়ালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ব্ল্যাকমেইল ও আগ্রাসনের অস্ত্র শানাচ্ছে।

প্রথমেই ধরা যাক মহাকাশ অস্ত্রের কথা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের "উদ্যোগে" নির্মিত এ-এক নতুন ধরনের অস্ত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, যার মধ্যে মার্কিন বিশেষজ্ঞ আছেন, এ-অস্ত্র অত্যন্ত কার্যকর আঘাত হানার অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। উৎক্ষেপণের পর বক্রগতি ক্ষেপণাস্ত্রের উপরই শুধু যে এ-অস্ত্র আঘাত হানতে পারে তা নয়, মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে, আকাশ ও সমুদ্রে লক্ষ্যবস্তুর উপরও আঘাত হানতে পারে এ-অস্ত্র। এই লক্ষ্যবস্তু হতে পারে উৎক্ষেপণ ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্র, কম্যাণ্ড, নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগকেন্দ্র, বিভিন্ন কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত বিমান এবং আরও অনেক স্থির এবং সচল লক্ষ্যবস্তু। মূলগত-ভাবে নতুন যে সব নজরদারি, পরিচালনা ও ধ্বংসমূলক কৃৎকৌশল গড়ে তোলা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা প্রতিরক্ষা এবং আগ্রাসন উভয় কাজেই ব্যবহার করে যেতে পারবে। প্রেসিডেন্টের স্ট্র্যাটেজিক কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মার্কিন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও 'ন্যাটো' গোষ্ঠীভুক্ত মিত্রদের অন্য যে কোন কথাই বোঝান না কেন।

তাছাড়া মহাকাশ সামরিকীকরণ পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে গিয়েও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোটেই চায় না বিশেষ করে রণনৈতিক ক্ষেপণাস্ত্র সহ রণনৈতিক ত্রিবর্গ (triad) কর্মসূচী বাতিল করা হোক। প্রতিরক্ষা সচিব ওয়েনবার্জার-এর যে প্রতিবেদন ১৯৮৫ সালের ১ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গিয়েও "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে... সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর বিধ্বংসী নির্ভুল আঘাত হানার ক্ষমতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে"।

তিনি নতুন এম-একস ও মিজেটম্যান আইসিবিএম, সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণক্ষম ট্রাইডেন্ট-২ স্ট্র্যাটেজিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের কথাই বলছিলেন।

দুটি নতুন ধরনের স্ট্র্যাটেজিক বোমারু বিমান-বি-আইবি ও এটিবি নির্মিত হচ্ছে, ইওরোপে আরও বেশী করে পের্শিং-২ ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ক্ষেপণযোগ্য দূরপাল্লার ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হচ্ছে, স্ট্র্যাটেজিক বোমারু বিমান এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রে নিউক্লিয়র শক্তিচালিত ডুবোজাহাজ এবং সাধারণ জাহাজ দূরপাল্লার ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে ১৭০০০ নতুন নিউক্লিয়র অস্ত্রফলক অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নির্মিত হচ্ছে। এই স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্রসজ্জা কর্মসূচী রূপায়ণ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুসরণ করে, তাহল, প্রথম নিউক্লিয়র আঘাত হানার ক্ষমতা অর্জন। আর মহাকাশে আক্রমণ হানার অস্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য হল এই ক্ষমতাকে দশগুণ বাড়ানো।

এগুলি হল ঘটনা আর এই সব ঘটনা দ্ব্যর্থহীনভাবে দেখিয়ে দেয় মহাকাশ ঢাল নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র একটি মহাকাশ ও নিউক্লিয়র তলোয়ারও নির্মাণ করছে।

বুঝতে কষ্ট হয় না, যদি "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী রূপায়িত করা যায় তাহলে পেণ্টাগণের অপরিণামদর্শী রণনীতি-বিশারদেরা, মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ঢালের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়র ও মহাকাশ অস্ত্রপ্রয়োগের সুযোগ নিতে প্রলুব্ধ হতে পারে। এই ধারণার মূলে রয়েছে এই আশা যে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র করা যাবে, তারা প্রতি-আক্রমণ হানার কোনো সুযোগ পাবে না আর এটা ঘটবে তখনই যখন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর সর্বাত্মক আঘাত হানার জন্য স্ট্র্যাটেজিক ও মহাকাশ অস্ত্র ব্যবহার করবে।

'স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভের' সপক্ষে ওয়াশিংটন যে যুক্তিই দিক না কেন, এর অতিবিপজ্জনক ও আগ্রাসী চরিত্র অতিশয় স্পষ্ট। 'তারকা যুদ্ধ' কর্মসূচী নিউক্লিয়র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির মার্কিন রণনীতিরই অঙ্গ। 'এস ডি আই'-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হল অপরিণামদর্শী নিউক্লিয়র হামলার সুযোগ তৈরী করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অনান্য দেশকে নিউক্লিয়র ব্ল্যাকমেইলের সাহায্যে হয়রাণি করা।

তাদের এই অত্যন্ত বিপজ্জনক মহাকাশ প্রকল্পকে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষামূলক বলে বর্ণনা করলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য যেসব দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা মজবুত করার স্বার্থ রয়েছে তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। সোভিয়েত নেতৃত্ব ঐকান্তিকভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক প্রাধান্য এনে দিতে পারবে না। বরং অনিবার্যভাবেই তা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের নিরাপত্তা বিপন্ন করবে।

"তারকা যুদ্ধের" উদ্যোক্তারা, যাদের তারা এই প্ররোচনামূলক প্রশাসনে যোগ দেবার জন্য উস্কাচ্ছে তারা এই কথাটা ভুলে না গেলেই ভালো করবে।

"বিশুদ্ধ" বিজ্ঞান না ম্যানাহ্যাটান-২ ?

মার্কিন প্রশাসন বলছেন 'এস ডি আই' একটা নিছক গবেষণা প্রকল্প এবং এর থেকে নতুন কোনো অস্ত্র যে সৃষ্টি হবে এমন কোনো কথা নেই। ওয়াশিংটন আমাদের বিশ্বাস করতে বলে যে ব্যাপারটা বিজ্ঞানের গবেষণার স্তরের বাইরে নাও যেতে পারে ; নিছকই বিদ্যালয়ের গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

কিন্তু এইসব কথাবার্তার মধ্যে একমাত্র "বিশুদ্ধ" যা তাহল এইসব কথাবার্তার বিশুদ্ধ প্রতারণামূলক চরিত্র।

তৎকালে ম্যানাহ্যাটান পারমাণবিক বোমা প্রকল্পও শুরু হয়েছিল গবেষণা কর্মসূচী হিসেবেই। হিরোশিমা ও নাগাসাকির জনসাধারণের পক্ষে এর পরিণাম কি হয়েছিল তা সকলেরই জানা আছে। তখন থেকেই পৃথিবী নিউক্লিয়র বিপদের ছায়ায় বাস করে আসছে। "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী মানবসমাজের জন্য ডেকে আনছে এক নতুন এবং আরো বড়ো রকমের বিপদের সম্ভাবনা। তাই বেশী দেরী হয়ে যাবার আগেই একে নিষিদ্ধ করতে হবে, গবেষণা সহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

"তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী নিছক একটা তাত্ত্বিক ব্যায়াম এই মিথ্যাকে অতি সহজেই খণ্ডন করা যায় যদি মনে রাখা যায় কী অভূতপূর্ব বিপুল অর্থ এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ম্যানাহ্যাটান প্রকল্পে খরচ হয়েছিল ১৫ বিলিয়ন ডলার। ১৯৫৪ থেকে ১৯৮৩ (৩০ বছরে) সালের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র গবেষণায় খরচ হয়েছে ৪০ বিলিয়ন। আগামী পাঁচ বছরে "তারকা যুদ্ধ" কর্মসূচীর গবেষণায় খরচ হবে ২৬ বিলিয়ন ডলার এবং ১৯৮৪—১৯৯৩ এই বছরে ৬০ বিলিয়ন ডলার। আমেরিকার বিজ্ঞানীদের ফেডারেশনের হিসাব অনুসারে অবশ্য এই ব্যয়ের পরিমাণ ৯০ বিলিয়ন ডলার দাঁড়াতে পারে। আর যদি এই গবেষণা আরও দশ বছর স্থায়ী হয় তাহলে ব্যয়ের পরিমাণ ২২৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াতে পারে। এথেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই প্রকল্প একটা "নির্দোষ" বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রকল্প নয়, মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তি মুহূর্ত।

তাই, "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী ১৯৭২ সালের এবিএম ব্যবস্থার সীমানা সংক্রান্ত চুক্তির চৌহদ্দি অতিক্রম করবে না বলে মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তারা যে আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য শোনায় না।

এই ধরনের আশ্বাসবাণীর উদ্দেশ্য হল যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকলাপের ফলে যে এবিএম চুক্তি বানচাল হচ্ছে তা গোপন করা। এবিএম চুক্তি অনুসারে মহাকাশ-ভিত্তিক এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তোলা, তার পরীক্ষা চালান বা ঐ ব্যবস্থা বা তার অংশ-বিশেষ মহাকাশে স্থাপন করা নিষিদ্ধ। তথাপি, মার্কিন প্রশাসন সরকারিভাবেই 'এস ডি আই'-কে ফেডারেল গবেষণা কর্মসূচী হিসাবে ঘোষণা করেছে যার লক্ষ্য হল 'দেশ-জোড়া' এবিএম ব্যবস্থা এবং মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র সৃষ্টি করা। তাই এই কর্মসূচীর ঘোষণাই এবিএম চুক্তির ধারাগুলির পরিবাহী। দুনিয়াজোড়া এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তোলা তো নিশ্চয়ই চুক্তি লঙ্ঘন, এ-কারণেও বটে যে গবেষণা তাত্ত্বিক অনুশীলনের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্রের প্রোটোটাইপ (নমুনা)—রাসায়নিক ও এক্স-রে লেসার, ত্বরিৎ-চুম্বক বন্দুক, বাধাদানকারী ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানো হচ্ছে, এদের মধ্যে কোনো কোনোটির পরীক্ষাও হয়ে গেছে মার্কিন গবেষণাগারে বা পরীক্ষা ক্ষেত্রে। এ-সবই মহাকাশভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী ব্যবস্থার অংশবিশেষ। এই সংক্রান্ত সব কাজই এবিএম চুক্তিবিরোধী এবং অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে এবং নিষিদ্ধ করতে হবে।

গবেষণা শেষ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো মহাকাশে স্থাপনযোগ্য উপাদান সহ সমগ্র 'দেশজোড়া' এবিএম ব্যবস্থা গঠন বাতিল করতে পারে প্রশাসনের এই আশ্বাস বিশ্বাসযোগ্য নয়। মহাকাশ অস্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের নিছক কেতাবি আলোচনার জন্য ৬০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে এরকম কথা বিশ্বাস করা হাস্যকর।

১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে রয়েল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্রিটেনের বিদেশ সচিব জেওফ্রে হাও আমেরিকার মহাকাশ অস্ত্র গবেষণার অপরিবর্তনীয় চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, "গবেষণা একটি অপ্রতিরোধ্য গতিসঞ্চয় করতে পারে, যদিও হয়তো যত বছর যাবে (গবেষণা) বন্ধের দাবিও প্রবল হবে।" মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিজ্ঞান সংক্রান্ত উপদেষ্টা জর্জ এ কেওয়ার্থ যেমন বলেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন পদার্থবিদ্যায় তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নয়, 'দেশজোড়া' একটা ব্যবস্থা নির্মাণের জন্যই।

"দেশজোড়া" মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থা নির্মাণে আমেরিকার প্রধান প্রধান সামরিক শিল্প-কর্পোরেশনগুলির স্বার্থ জড়িত। মহাকাশ সামরিকী-করণকে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' আগামী দশকগুলি মার্কিন মনোপলিগুলির পক্ষে স্বর্ণখনির সঙ্গে তুলনা করেছে। পত্রিকাটি লিখেছে : " 'তারকা যুদ্ধের' মর্মকথা হল…সামরিক-শিল্প সমাহারগুলির পক্ষে বিপুল এক আশীর্বাদস্বরূপ।" কাউন্সিল অব ইকনোমিক প্রাইওরিটিজ নামে একটি মার্কিন গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি একটি

প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, "দেশজোড়া" এবিএম ব্যবস্থার ব্যয়, কার্যকরতা এবং অস্ত্রসীমিতকরণ প্রক্রিয়ার উপর তার প্রভাব নির্ণয় করার ভার মার্কিন প্রশাসন ইচ্ছা করেই দিয়েছে সেই মার্কিন কর্পোরেশনগুলির উপর যাদের ভাগ্যে জুটেছে মহাকাশ অস্ত্র-নির্মাণ ব্যয়বরাদ্দের সিংহভাগ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এবিএম কনট্রাকটের ৮০ শতাংশই দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত কম্পানিগুলিতে কংগ্রেসে যাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে প্রভাবশালী সেনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা। 'দেশছাড়া' ক্ষেপণাস্ত্রবিধ্বংসী ব্যবস্থার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয়মঞ্জুরের অনুরোধ জানাতে পারে পেণ্টাগন তা পাশ হবে কিনা তা নির্ভর করে এই সব জনপ্রতিনিধিরা কিভাবে ভোট দেবেন তারই উপর।

একই সঙ্গে ওয়াশিংটন তার ন্যাটো মিত্রদের ও জাপানের কাছে সরাসরিভাবে 'তারকা যুদ্ধের' জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার দাবি জানিয়েছে। তাদের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সব রকমের ছলাকলার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে—'সোভিয়েত সামরিক শ্রেষ্ঠতার' ধুয়া তুলে তাদের ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে, 'তারকা যুদ্ধের' কর্মসূচীর আসল উদ্দেশ্য গোপন করা হচ্ছে, তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে পাশ কাটিয়ে ওয়াশিংটন জার্মান ফেডেরাল রিপাবলিকের, ব্রিটিশ, ইতালীয় ও ফরাসী দেশের কম্পানিগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছে তাদের সহযোগিতা লাভের জন্য এবং সর্বশেষ কৃৎকৌশলের অংশভাক করার প্রতিশ্রুতি নিয়েও জল্পনা কল্পনা করা হচ্ছে।

কিন্তু পশ্চিমী ইওরোপীয়রা ভেবে দেখছে এর ফলে তারা আমেরিকার উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে কি না, সামরিক মহাকাশ গবেষণার কৃৎকৌশলগত ও বাণিজ্যিক লভ্যাংশ সবটাই যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাবে কি না? তাদের এই সন্দেহ খুবই সংগত কেননা যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদাররা তাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বেশ ভালো করেই জানে আমেরিকানরা তাদের কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবন কখনই ন্যায়সংগতভাবে ভাগাভাগী করে নেয় না। এখনও আমেরিকা কার্যত তার মিত্রদের দোহন করতেই চাইছে, তাদের বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের সেরা অংশটুকু আত্মসাৎ করে, পরিবর্তে নিজেদের কিছুই তারা দেবে না। তাদের কাছ থেকে একমাত্র যে 'বর' পাওয়া যাবে তা হল অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ের বোঝা। পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির ঘাড়ে এই বোঝা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসবে।

পশ্চিম ইওরোপের জনসাধারণও রেগনের 'এস ডি আই' কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্ধিহান। তারা সংগতভাবেই তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, যেমন, মহাকাশ বর্ম তৈরি হলে আমেরিকা প্রথম নিউক্লিয়র আঘাত হানার ক্ষমতার অধিকারী হবে, এই পরিকল্পনা যদি কার্যকর হয় তাহলে তার শেষ পরিণাম যাই হোক না কেন, সমগ্রভাবে তা রণনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে দেবে।

লেসার ও অন্যান্য মহাকাশ অস্ত্র অন্য পক্ষের সমস্ত নজরদারি উপগ্রহ অকেজো করে দিতে পারে যার ফলে তার স্ট্র্যাটেজিক বাহিনী কানা হয়ে যাবে।

তার মুখ্য বিষয় হল এই যে ন্যাটো দেশগুলির জনসাধারণ এটা না বুঝে পারেন না যে ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী বর্ম তাদের নিরাপত্তা বাড়াবে না। পরন্তু, যদি স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে পশ্চিম ইওরোপ সামরিক দিক দিয়ে আরও সহজ ভেদ্য হয়ে পড়বে। সেই কারণেই বন, লণ্ডন ও অন্যান্য পশ্চিমী রাজধানীগুলির আশা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটো সহযোগীদের সম্মতি না নিয়ে মহাকাশ-ভিত্তিক এবিএম ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে না। কিন্তু এই আশা নিছক অলীক কল্পনা। যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের সিদ্ধান্ত একক ভাবেই করে থাকে।

মানবজাতির স্বার্থের বিচারে মহাকাশকে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র করে তোলাটা হবে মারাত্মক ভুল। এরকমটা ঘটুক যারা চান না তাদের এমন কোনো কাজ মেনে নেওয়া উচিত নয় যার লক্ষ্য মহাকাশ অস্ত্রের বিকাশ ঘটানো। এই ধরনের কোনো কাজে যোগ দেবার অর্থ হবে মার্কিন সমরবাদীরা জাতিসমূহের বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘঠিত করতে উদ্যত তার অংশীদার হওয়া।

গবেষণা সহ মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করা ও তাকে অবৈধ ঘোষণা করার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধ নেই। সমস্ত প্রতিবন্ধই 'যুক্তি' ও 'আপত্তির' আকারে কষ্টকল্পিত। এর মধ্যে পড়ে বস্তাপচা 'সোভিয়েত বিপদের' অতিকথা যা ওয়াশিংটন প্রচার করে যাচ্ছে এবং তাদের অসংগত অযাচিত উক্তি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি 'উচ্চতর' হারে মহাকাশকে সামরিকভাবে ব্যবহার করছে। এইসব যুক্তির কোনোটারই কোনো ভিত্তি নেই এবং তাড়াহুড়ো করে বানানো। যখন মার্কিন প্রশাসন 'তারকা যুদ্ধ' প্রকল্প ঘোষণা করে তখন তারা কিন্তু সোভিয়েত 'এগিয়ে আছে' এ-কথা বলে নি। আসলে তাদের লক্ষ্য হল 'স্বর্গে' আরোহণ করে সেখান থেকে শক্তির অবস্থানের রাজনীতি চালানো।

অবশ্যই সোভিয়েত ইউনিয়নে মহাকাশ গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং সামরিক ক্ষেত্রেও। কিন্তু তার কোনোটারই লক্ষ্য নয় মহাকাশ থেকে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণ বা 'দেশ জোড়া' এবিএম ব্যবস্থা স্থাপন। এর লক্ষ্য হল সতর্কীকরণ, নজরদারি, যোগাযোগ ও চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন কোনো মহাকাশ অস্ত্র নির্মাণ করছে না। এবং 'দেশজোড়া' কোনো ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো ইচ্ছাও তার নেই। আমেরিকা যা করছে সোভিয়েত ইউনিয়নও তার অনুরূপ কিছু করছে এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১৯৭২ সালে যে স্থায়ী এবিএম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন তা কঠোরভাব মেনে চলছে।

নিউক্লিয়র অস্ত্রসজ্জা না তার ধ্বংসসাধন ?

আগুন নেভাতে গেলে তার উপর গ্যাসোলিন ঢালতে হবে কোনো যুক্তিবাদী মানুষ কি এই উপদেশ দিতে পারেন ? প্রশ্নটাই উন্মাদের এবং খাপছাড়া।

তবু এমন অনেক রাষ্ট্রনায়ক আছেন সমগ্র মানবজাতির নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নে যাঁরা এমনি ধারা কথাই বলে থাকেন। কথাটা মার্কিন 'তারকা যুদ্ধ' প্রকল্প সম্পর্কে প্রযোজ্য। এর রচয়িতারা দাবি করে থাকেন এর ফলে নাকি অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান হবে এবং নিউক্লিয়র অস্ত্র ধ্বংস হবে। এসডিআই নিউক্লিয়র অস্ত্র নির্মূল করার পথ—এই দাবি করেও কিন্তু মার্কিন প্রশাসন তাড়াহুড়ো করে স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে এবং নতুন নতুন ধরনের নিউক্লিয়র অস্ত্র নির্মাণ করছে।

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে কিন্তু স্বীকৃত এটা বন্ধের প্রয়োজনীয়তা, দুপক্ষের নিউক্লিয়র অস্ত্রভাণ্ডার স্তম্ভিত করা এবং তারপর তা হ্রাস করতে অগ্রসর হওয়া। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক সেই আহ্বানই জানাচ্ছে।

কিন্তু ওয়াশিংটনের কর্তাদের মনে রয়েছে অন্য চিন্তা। তারা চাইছে স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্রসজ্জা চালিয়ে যেতে, মহাকাশের সামরিকীকরণ করতে, মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং আঘাত হানার অস্ত্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে। পরে, যখন এই সবকিছু কাজ সম্পন্ন হবে, 'সম্ভবত আজ থেকে অনেক দশক পরে' নাকি সময় আসবে শুধু হ্রাসের নয়, নিউক্লিয়র অস্ত্র ধ্বংস করার। এই কুযুক্তি অনুসারে ধ্বংস করার আগে নিউক্লিয়ার অস্ত্রভাণ্ডার কয়েকগুণ বাড়িয়ে যেতে হবে। এটাই নাকি একমাত্র উপায়।

কেন ? জনসাধারণকে প্রতারণা করতে কার্যকরভাবে নিউক্লিয়র অস্ত্রভাণ্ডার হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে, যুদ্ধপ্রস্তুতি আরও চালিয়ে যাবার সাফাই রচনা করতে, যার অন্তর্গত নিউক্লিয়র অস্ত্রভাণ্ডার স্ফীত করা এবং মহাকাশের সামরিকীকরণ করা।

এই পথের সত্যিকারের অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিণাম অতি সাবধানে জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন করা হচ্ছে। তেমনি গোপন করতে চাইছে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র সম্ভারের পারস্পরিক বাস্তব সম্পর্ক। ব্যাপারটার মূল কথা একটু স্মরণ করা যাক।

বিগত ৩০ বছরের অধিককাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েরই স্ট্র্যাটেজিক নিউক্লিয়র অস্ত্র রয়েছে আর এই সারাটা সময় ধরেই আমেরিকার সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকেও

ঐ ধরনের অস্ত্র উদ্ভাবন করতে হয়েছে এবং পরে তা স্থাপন করতে হয়েছে। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে রণনৈতিক সমতা অর্জিত হবার পর নিউক্লিয়র হুমকি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় আমেরিকা এবং স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনায় সম্মত হয়।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে আলোচনা শুরু করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে রণনৈতিক আক্রমণ ক্ষমতার সমতার অবস্থায় যেকোনো পক্ষের অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা ক্ষমতা অর্জন নিবর্তনমূলক নিউক্লিয়র আক্রমণ ক্ষমতা অর্জনের সামিল হবে।

নিউক্লিয়র রেষারেষির যুক্তিটা এমনই যে স্তর বিন্যস্ত ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা স্থাপন শুধু প্রতিরক্ষামূলক লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, সামরিক প্রাধান্য অর্জন প্রয়াসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যবস্থা সামরিক রণনৈতিক সমতা ক্ষুণ্ণ করবে এবং সমগ্রভাবে রণনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে দেবে। জবাবে অন্য পক্ষেরও সমতা ফিরিয়ে আনবার জন্য, নিজের রণনৈতিক সক্ষমতা বাড়াবার জন্য হয় সরাসরি আক্রমণ চালাবার বাহিনী বাড়াতে হয় নয়তো প্রতিরক্ষার উপায়ের সাহায্যে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই এর ফলে অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটবে।

আক্রমণাত্মক আর প্রতিরক্ষামূলক স্ট্র্যাটেজিক ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের একই সঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬শে মে স্বাক্ষরিত এবিএম ব্যবস্থা সীমিতকরণ সম্পর্কে স্থায়ী চুক্তিতে এবং স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্তর্বর্তী চুক্তিতে। নিউক্লিয়র অস্ত্র সীমিতকরণ ও হ্রাসের সমগ্র প্রক্রিয়ায় এবিএম চুক্তি হয়ে দাঁড়ায় ভিত্তি প্রস্তর।

চুক্তিতে বলা হয়েছে, স্বাক্ষরকারীরা মনে করে "এবিএম ব্যবস্থা সীমিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়াবে এবং এর ফলে নিউক্লিয়র অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার বিপদ অনেকটা কমে যাবে।" অন্য ভাবে বললে, এবিএম ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংযম স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সীমিতকরণ ও হ্রাসের ব্যাপারে প্রগতির সহায়ক হয়।

স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র আর প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রের মধ্যে মৌলিক পারস্পরিক সম্পর্কের সংস্থান মার্কিন 'তারকা যুদ্ধের' প্রবক্তারা আজ বানচাল করছেন। তাঁরা ভান করছেন যে তাঁরা এই সংস্থান মেনে নিয়েছিলেন এই কারণে নয় যে তাঁরা এবিএম ব্যবস্থার অস্ত্রপ্রতিযোগিতার অনুঘটক হয়ে ওঠার বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা এতে সম্মতি দিয়েছিলেন নিছক এই কারণে যে সে

সময়ে যথেষ্ট কার্যকর এবিএম ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো কারিগরি সক্ষমতা তখন তাঁদের আয়ত্তে ছিল না।

কিন্তু ঘটনা হল এই যে স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে একটা জৈবিক অন্তঃসম্পর্ক বাস্তবে রয়েছে আর তা অপরিবর্তনীয় চরিত্রের। যখন আরও সূক্ষ্ম ও কার্যকর এবিএম ব্যবস্থা গঠন কারিগরি বিদ্যার দিক থেকে সম্ভব হবে তখনও এই চরিত্র বদলে যাবে না। বরং এই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে তা উভয় পক্ষের স্ট্র্যাটেজিক বাহিনীর পারস্পরিক সংস্থানকে দৃশ্যত অনেক বেশী পরিমাণে প্রভাবিত করবে এবং তা অত্যন্ত অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে এবং নিউক্লিয়র যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা অকস্মাৎ বেড়ে যাবে, মানবজাতির উপর তার বিপর্যয়কর সমস্ত পরিণাম সমেত।

এমনকি যদি দুপক্ষেরই প্রায় সমান কার্যকর 'দেশজোড়া' এবিএম ব্যবস্থা থাকেও, বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে তাদের কার্যকরীতা প্রায় উপেক্ষণীয়, ইতর-বিশেষ ঘটলেই অনিবার্যভাবে সামরিক রণনৈতিক ভারসাম্য বহুল পরিমাণে বিপর্যস্ত হবে এবং তা সারা দুনিয়ার রণনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে দেবে।

কাণ্ডজ্ঞানের বিচারকে উপেক্ষা করে মার্কিন প্রশাসন মহাকাশে অস্ত্র প্রতি-যোগিতা পরিহার করার ধারণা বিবেচনা করতেও অস্বীকার করছে, মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণের উপর স্থগিতাদেশের প্রস্তাবের তারা বিরোধিতা করছে এবং ঐসব নতুন, অত্যন্ত বিপজ্জনক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছে। তারা বাজী ধরছে তথাকথিত স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভের উপর এবং এর বিজ্ঞাপিত লক্ষ্য শান্তিকে মজবুত করা সম্পর্কে মিথ্যা এবং বিপজ্জনক মোহ বিস্তার করার প্রয়াস করছে। বস্তুতপক্ষে ওয়াশিংটন মানবজাতিকে অস্ত্রপ্রতি-যোগিতার এক নতুন বিপর্যয়কর পর্যায়ের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, ঠেলে দিচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক অর্থহীন অপচয়ের দিকে। আর এ-সবই করা হচ্ছে সামরিক প্রাধান্য অর্জনের এবং তার দ্বারা পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার নিষ্ফল প্রয়াস।

মহাকাশ কর্মসূচী চালিয়ে যাবার পথ ধরেই এগোবে এটা স্থির করেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন ভান করছে যেন তারা বড়ো রকমের নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাস সত্যিই চায়। তাদের এই 'চাওয়াটা' ভুয়া, কেননা মহাকাশভিত্তিক যে ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা তারা গড়ে তোলার প্রয়াস করছে তা সর্বক্ষেত্রে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা অবধারিত করে তুলছে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করছে। নিউক্লিয়র অস্ত্রের আবির্ভাবে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র বাতিল হয়ে যায় নি বরং প্রচলিত ও নিউক্লিয়র উভয় প্রকারের অস্ত্রপ্রতিযোগিতাই তীব্রতর হয়েছে। তেমনি মহাকাশ অস্ত্রের আবির্ভাবের অস্ত্র প্রতিযোগিতা আরও তীব্রতর হবে এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে।

স্থিতিশীলতা না অজানার উজানে?

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা পল নিৎসেকে এস. ডি. আই-এর পরিণাম সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত করা হয় নি, এমন সন্দেহের কোন কারণ আছে কি ? সেই নিৎসেই বলেছেন, বর্তমান অবস্থা থেকে "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচীর পরিপূর্তিতে উত্তরণ দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং প্রতিরক্ষার কারিগরি উপায় যদি নির্ভরযোগ্যও হয় তাহলেও এটা হবে বিপজ্জনক। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা যেসব কথা বলতে পারতেন তা বলেন নি। প্রধান যে কথাটা তিনি বলেন নি তাহল নিউক্লিয়র ডাণ্ডা-বেড়ী বাঁধা যে মানবজাতি একটা অতল খাদের সামনে টলমল করছে, তার বুটে এবার মহাকাশ শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া হবে, অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র যদি তার নিজের মর্জিমতো চলতে পারে। জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, কেন ? মার্কিন প্রশাসনের জবাব হল, মহাকাশে আঘাত হানার অস্ত্র নির্মাণের জন্য, তাদের দাবি অনুসারে, যা রণনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে।

"তারকা যুদ্ধ" প্রকল্পের রচয়িতারা যে কথা বলেছেন তা যে কতটা আজগুবি এবং মিথ্যা তা বুঝতে কোনো প্রথমোক্ত বিশেষজ্ঞর জ্ঞান দরকার হয় না। এ-প্রসঙ্গে ওয়েনবার্জারের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। যদি যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ভূমিকা বদলান হত, যদি প্রথমোক্ত না হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন "তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচী গ্রহণ করত তাহলে তাঁর মনোভাব কি হত—এই প্রশ্নের জবাবে পেণ্টাগনের বড়কর্তা বলেছিলেন, সে খুব খারাপ হত, পরিস্থিতিটা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। এতক্ষণে তাহলে মহাকাশ অস্ত্রের স্থিতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে সত্য ফাঁস হল !

"তারকা যুদ্ধের" কর্মসূচীর গায়ে যতই না মানবিকতার লেবেল লাগান যাক, তাতে তার ভূমিকা প্রতিরক্ষামূলক বা স্থিতিশীলতা বর্ধক হয়ে উঠবে না। প্রেসিডেণ্ট রেগনের 'স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ' অস্থিতিশীলতাই ডেকে আনবে এবং যুদ্ধের বিপদ বাড়িয়ে তুলবে। নতুন প্রজন্মের বিধ্বংসী অস্ত্রের সাহায্যে শান্তিকে সংহত করা যায় না। বরং তাতে নিউক্লিয়র যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

যদি মহাকাশের সামরিকীকরণ করা হয় তাহলে নিউক্লিয়র যুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে শুধু এই কারণে নয় যে এর ফলে দুপক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর কাঠামোগত পরিবর্তনতো হবেই, তদুপরি যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হবে

যে তারা অপরাজেয়। পশ্চিমী সামরিক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ-সম্পর্কে অবহিত। তাঁরা মনে করেন শেষ লক্ষ্য যাই হোক না কেন, এস. ডি. আই. কর্মসূচী হাতে নেওয়াই এক ধরনের প্ররোচনামূলক কাজ। যেমন লণ্ডনস্থ ইণ্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ তাদের "১৯৮৪-১৯৮৫ সালের রণনৈতিক সমীক্ষায়" জোর দিয়ে বলেছে, "যদি স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষার ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় তাহলে তা স্থিতিশীলতাকে ক্ষুণ্ণই করবে, শক্তিশালী করবে না। রূপান্তরকালীন সময়ে. যদি একপক্ষের স্ট্র্যাটেজিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে অন্য পক্ষের না থাকে তাহলে তারা প্রথম আঘাত হানার রণনীতি ভেবে দেখবে।" প্রতিবেদন রচয়িতার মতে প্রেসিডেণ্ট রেগনের "প্রতিরক্ষা উদ্যোগ" (এস. ডি. আই) আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অনেকটাই বড়াবে এবং জেনিভায় সোভিয়েত মার্কিন আলোচনায় প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

"তারকা যুদ্ধ" প্রকল্পের আর একটা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারী দিক হল যে এই প্রকল্প রূপায়িত করতে গেলে অনিবার্যভাবে কতকগুলি বর্তমান চুক্তি ভঙ্গ করতে হবে। তার মধ্যে কিছু দ্বিপক্ষীয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এবং কিছু বহুপক্ষীয়, যার লক্ষ্য অস্ত্রপ্রতিযোগিতা রদ করা এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মজবুত করা। এটা প্রযোজ্য প্রথমত ১৯৭২ সালের স্থায়ী এবিএম ব্যবস্থা সীমিতকরণ চুক্তি ; বায়ুমণ্ডলে, মহাকাশে এবং জলের নিচে নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করে ১৯৬৩ সালের চুক্তি ; এতে স্বাক্ষর করছে ১০০ টির অধিক রাষ্ট্র, ১৯৬৭ সালে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহাদি সহ মহাকাশ অভিযান এবং মহাকাশ ব্যবহারে রাষ্ট্রসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের নীতি সংক্রান্ত চুক্তি যাতে ৭০টির অধিক রাষ্ট্র স্বাক্ষর করে।

উপরোক্ত চুক্তিগুলি অস্ত্র সীমিতকরণ ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করে। এই চুক্তিগুলি বানচাল করার অর্থ দাঁড়াবে অস্ত্র প্রতিযোগিতার চক্রাবর্তে নতুন মোচড় দেওয়া এবং মহাকাশেও তার সম্প্রসারণ। এর প্রভাব পড়বে শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার জনসাধারণের ভবিষ্যতের উপরেই নয়, সমস্ত জাতির ভবিষ্যতের উপরও। এইজন্যেই প্রয়োজন এবিএম ব্যবস্থা সীমিতকরণ সংক্রান্ত সোভিয়েত আমেরিকান চুক্তির (১৯৭২) প্রতি আরও ঘনিষ্ঠভাবে দৃষ্টিপাত করা। ঐ চুক্তি নিউক্লিয়র অস্ত্র সীমিতকরণে এবং তা হ্রাস করার সমগ্র প্রক্রিয়াটির ভিত্তি রচনা করেছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মৌলিক দলিলটিকে নস্যাৎ করে তাহলে মানবজাতির নিউক্লিয়র অস্ত্র সীমিতকরণের আশাই বিলীন হবে। নিউক্লিয়র অস্ত্র সীমিতকরণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই চুক্তিটির বেঁচে থাকা ও শক্তি অর্জনের উপর। রণনৈতিক স্থিতিশীলতার

স্বার্থে তাই মহাকাশ ভিত্তিক উপাদান সহ "দেশজোড়া" ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা স্থাপনের চিন্তা বাতিল করা দরকার এবং স্থায়ী এবিএম চুক্তি কঠোরভাবে মেনে চলা দরকার। স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র সীমিতকরণের ব্যাপারে এই চুক্তিটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

অস্ত্র প্রতিযোগিতার একটি নতুন পর্যায় রোধের জন্য, মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ রাখার জন্য, মানুষের মনে ভবিষ্যতের উপর আশা প্রোজ্জ্বল রাখার জন্য কিছু করার এখনও সময় আছে। এর জন্য প্রয়োজন সাহসী ও সুবিবেচিত রাজনৈতিক কার্যক্রম। আজকের দিনে কোন্ নীতি কতটা পরিণত তার পরীক্ষা হবে এই নিরিখেই, কোনো সমাজ এবং তার নেতৃত্ব মানবতা এবং সংস্কৃতির কোন্ অবস্থায় পৌঁচেছে তারও পরীক্ষা হবে এই নিরিখেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচভ জোর দিয়ে বলেছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সত্যিকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দুই দেশের নেতাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা। সোভিয়েত পক্ষে এই ইচ্ছা আছে।"

অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করার উপায়

অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা ছাড়া মানবজাতির সামনে আর কোনো পথ খোলা আছে কি ?

বিনা দ্বিধায় সোভিয়েত ইউনিয়নের জবাব হল, হ্যাঁ আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ কয়েক প্রস্থ সুস্পষ্ট এবং গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছে যার লক্ষ্য মহাকাশের সমারিকীকরণ এড়ানো ; নিউক্লিয়র অস্ত্রের স্ট্র্যাটেজিক ও মাঝারিপাল্লার সীমিতকরণ ও হ্রাস ; সব ধরনের নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা রদ ; রাসায়নিক অস্ত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ঐ অস্ত্রের ধ্বংসসাধন ; নতুন ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা ; মধ্য ইউরোপে সামরিক রেষারেষি কমিয়ে আনা, বিশ্বাস এবং নিরাপত্তা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার 'ন্যাটো' মিত্ররা যদি এইসব সোভিয়েত প্রস্তাবের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দিত তাহলে শান্তির বনিয়াদ অনেক শক্ত হত।

মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা এড়ানো যাবে কিনা এবং পৃথিবীতে তা রোধ করা যাবে কি না তার উপর নির্ভর করছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ। মহাকাশকে যাতে যুদ্ধের বিপদের উৎসে পরিণত না করা হয় তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মৌল দৃষ্টিভঙ্গী হল এই যে উভয় পক্ষই মহাকাশ অস্ত্র পরিহার করবে এবং বর্তমান উপগ্রহ বিরোধী ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আরও প্রস্তাব হল একই সঙ্গে দুপক্ষ নিউক্লিয়র অস্ত্র ভাণ্ডার বড়ো রকমের হ্রাস করার জন্য আলোচনা শুরু করবে এবং নিউক্লিয়র অস্ত্র শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট করার লক্ষ্য স্থির করবে।

যদি মহাকাশ অস্ত্র বে-আইনি ঘোষিত হয়—আর সেটা নির্ভর করবে আমেরিকানদের উপরই—তাহলে স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র বড়ো রকমের হ্রাস সম্পর্কে চুক্তির পথ পরিষ্কার হবে। এর মধ্যে পড়বে সমস্ত স্ট্র্যাটেজিক প্রক্ষেপণ যানে মোট নিউক্লিয়র অস্ত্রফলকের সংখ্যা এবং প্রক্ষেপণ যানের মোট সংখ্যা।

ইউরোপে মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্রের সমস্যারও তাহলে গঠনমূলক-ভাবে সমাধান করা যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক ভিত্তিতে ইউরোপকে মাঝারি পাল্লার এবং ট্যাকটিক্যাল উভয় প্রকারের নিউক্লিয়র অস্ত্র মুক্ত করতে প্রস্তুত। এই ব্যাপারে সোভিয়েত প্রস্তাবাবলী সুবিদিত।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব, আলোচনা চলার পুরো সময়ের জন্য মহাকাশ অস্ত্র নির্মাণ (গবেষণা সহ), পরীক্ষা ও স্থাপনের উপর স্থগিতাদেশ দিতে হবে, স্ট্রাটেজিক নিউক্লিয়র অস্ত্রভাণ্ডার পরিমাণগত ও

গুণগতভাবে যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিতে হবে, এবং ইউরোপে নতুন করে আরও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন রোধ করতে হবে। পৃথিবীতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এবং মহাকাশে তা রোধ করার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে নিউক্লিয়রও মহাকাশ অস্ত্রের উপর স্থগিতাদেশ খুবই সময়োচিত, কার্যকর এবং সংগত ব্যবস্থা হবে। মহাকাশের সামরিকীকরণ রোধ করা সহ সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সমস্ত প্রস্তাব ইতিপূর্বে করেছে এগুলি হবে তদতিরিক্ত কিছু পদক্ষেপ। স্থগিতাদেশ কোন পক্ষের উপরই অন্য পক্ষের চেয়ে স্বতন্ত্র কোনো বিশেষ শর্ত আরোপ করবে না, শুধু আরও অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধ রচনা করবে। যদি দক্ষতার সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায় তাহলে এখনও এই লক্ষ্যে পৌঁছন যায়।

হোয়াইট হাউস, অবশ্য. সোভিয়েত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে এবং তাও এমন তাড়াহুড়ো করে যে সমস্ত দুনিয়া হতবাক। এটা করে আমেরিকান প্রশাসন দেখিয়ে দিয়েছে, তারা যে নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাস এবং মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা এড়িয়ে চলার কথা বলে থাকে তার মধ্যে ঐকান্তিকতা নেই।

নিউক্লিয়র ও মহাকাশ অস্ত্র সম্পর্কে সোভিয়েত মার্কিন আলোচনা সম্পর্কে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে জেনিভায় যে চুক্তি হয় তার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুকাল ধরেই ওয়াশিংটন নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছে। চুক্তির প্রকৃত মর্মকে বিকৃত করছে। আরও যা করছে তাহল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিস্তারের প্রশ্নটি কায়দা করে এড়িয়ে যেতে চাইছে এবং নিউক্লিয়র অস্ত্র সীমিতকরণ ও হ্রাসের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তা তারা বিবেচনা করতে অস্বীকার করে। স্পষ্টতই এর লক্ষ্য হল, আলোচনা যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "তারকা যুদ্ধের" পরিকল্পনার এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রসজ্জা কর্মসূচীর অন্তরায় হয়ে না ওঠে যার উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন। ওয়াশিংটনের ভদ্রলোকেরা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে রাজী নয়, তারা তাদের নীতি পরিত্যাগ করতেও সম্মত নয়, যদিও এই নীতি শান্তির পক্ষে বিপর্যয়কর।

একই সঙ্গে তারা স্থগিতাদেশের সোভিয়েত প্রস্তাবকে এই বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে যে এর ফলে নাকি স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণাত্মক অস্ত্র ও মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রাধান্য কায়েম থাকবে। কিন্তু এই ধরনের কোনো প্রাধান্য নেই। বারবার তথ্য ও সংখ্যা দিয়ে এটা প্রমাণ করা হয়েছে। উপযুক্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞরাও এই প্রমাণ মেনে নিয়েছেন। ওয়াশিংটনের ভদ্রলোকেরা জেনেশুনে তথ্যকে বিকৃত করে তাঁদের অভূতপূর্ব সামরিক কর্মসূচী ও

অস্ত্র প্রতিযোগিতার সাফাই রচনা করতে চেয়েছেন। মহাকাশকে সামরিকীকরণ না করা এবং নিউক্লিয়র অস্ত্র সম্ভার বড়ো রকমের ছাঁটাই করা সম্পর্কে জেনিভা আলোচনায় তারা যে কোনো রকম চুক্তিতে আসতে নারাজ, এই ভাবে তাঁরা তা গোপন করতেও চেষ্টা করেছেন।

আরও অনেক সমস্যা আছে যার সমাধান হলে তা নিউক্লিয়র নিরস্ত্রীকরণের উপর নিঃসন্দেহে সদর্থক প্রভাব ফেলবে। এর অন্যতম হল নিউক্লিয়র অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ রাখা। এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, নিউক্লিয়র অস্ত্রধর রাষ্ট্রগুলি পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট তারিখ থেকে সর্বপ্রকার নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের উপর স্থগিতাদেশ জারী করতে পারেন। সম্পূর্ণ এবং সাধারণভাবে নিউক্লিয়র অস্ত্র-পরীক্ষা নির্দিষ্ট করে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বলবৎ থাকবে। সহজ কথা এই, যদি পরীক্ষা বন্ধ থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট অস্ত্রের উৎকর্ষসাধনও বন্ধ থাকবে। নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ হলে তা হবে নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের ক্ষেত্রে একটা বড়ো রকমের পদক্ষেপ।

সেণ্টার ফর ডিফেন্স ইনফরমেশন নামে একটি মার্কিন সংগঠনের নেতারা ১৯৮৫ সালের ৬ অগাস্ট, হিরোশিমার পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ৪০ তম বার্ষিক দিবস থেকে সকল প্রকারের পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা স্থগিত রাখার এক আবেদন প্রচার করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন স্থগিতাদেশের এই নির্দিষ্ট তারিখটি মেনে নেয় এবং নিউক্লিয়র অস্ত্রপরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে ত্রিপক্ষীয় (যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন) আলোচনা অবিলম্বে পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানায়।

ভূগর্ভে নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা সীমিতকরণ ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ভূগর্ভে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ সম্পর্কে যথাক্রমে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালে যেসব সোভিয়েত-আমেরিকান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাকে কার্যকর করা হলেও একই উদ্দেশ্য সাধিক হবে। কিন্তু নানা অজুহাতে আমেরিকা এইসব চুক্তি অনুমোদন করতে অস্বীকার করে।

উত্তেজনা হ্রাস ও যুদ্ধের বিপদ লাঘব করার লক্ষ্য সাধিত হবে যদি সশস্ত্র বাহিনী না ব্যবহার করার একটি পারস্পরিক চুক্তি এবং শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ প্রস্তাবও করেছিল। স্টকহোম সম্মেলনে এই চুক্তির প্রস্তাবিত মুখ্য ধারা সংকলিত একটি দলিল পেশ করেছিল। কেন্দ্রীয় ধারাটি ছিল কোনপক্ষই অপর পক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম নিউক্লিয়র বা প্রচলিত অস্ত্র ব্যবহার না করায় অঙ্গীকার করবে এবং ফলত সাধারণভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে নিউক্লিয়র অস্ত্রধর শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক

সম্পর্ক কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নিয়ম-গুলিতে নিউক্লিয়র যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে, ব্যবস্থা থাকবে যুদ্ধ প্রচার বন্ধ করার, থাকবে প্রথমে নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি এবং নিউক্লিয়র অস্ত্র ছাঁটাই থেকে শেষ পর্যন্ত তা বিনষ্ট করার ব্যবস্থা। যুক্তভাবে এই সব নিয়ম মেনে চলা এবং সংশিষ্ট সকলের এই নিয়ম মেনে চলা আবশ্যিক করা সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে যেকোনো সময়ে আলোচনায় বসতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত আছে।

সর্বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল আমেরিকা সহ সমস্ত নিউক্লিয়র শক্তিধরের এই অঙ্গীকার করা যে তারা প্রথম নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করবে না। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে—সেই ১৯৮২ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর এতো স্পষ্ট যে যদি প্রথম আঘাত না থাকে তাহলে জবাবী আঘাতের প্রশ্নই উঠতে পারে না, আর তার মানে নিউক্লিয়র যুদ্ধই হতে পারে না। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা বানানো অজুহাত তুলে এই দায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এ-থেকে ন্যায়সংগতভাবেই প্রশ্ন ওঠে; আমেরিকা এই যে একবগ্গাভাবে মহাকাশে ঢুকে পড়ছে, আবার সেই সঙ্গে যদি প্রথম নিউক্লিয়র অস্ত্র না হানার অঙ্গীকার করতে এক বাক্যে অস্বীকার করে তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয় না যে মার্কিন প্রশাসক এক আগ্রাসী নীতিই অনুসরণ করছে, যতই না কেন এর উল্টো শান্তিকামী বুলি সে কপচাক?

স্বাক্ষ্যপ্রমাণ দৃষ্টে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় প্রেসিডেণ্ট রেগনের প্রশাসন অস্ত্র সীমিতকরণ ও হ্রাসের, বিশেষ করে নিউক্লিয়র অস্ত্রের ক্ষেত্রে, কোনো ধরা-ছোঁয়ার মতো চুক্তি করতে অনিচ্ছুক। সেই কারণেই তাঁদের প্রতিনিধিরা যখন দাবি করেন তাঁরা নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাস সম্পর্কে চুক্তিতে আসতে চান তখন তাঁদের সেই দাবির সঙ্গে প্রবল গতিতে ওয়াশিংটনের ঠিক ঐ ধরনের অস্ত্রগুলিরই ভাণ্ডার স্ফীত করা, 'দেশজোড়া' এবিএম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজ কম করা এবং নিউক্লিয়র পরীক্ষার ব্যাপারে স্থগিতাদেশের প্রস্তাবে এবং ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা আবার শুরু করার প্রস্তাবে তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা রোধ করা এবং পৃথিবীতে তা বন্ধ করা এবং তা থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বত্র সব রকম নিউক্লিয়র অস্ত্র বিনষ্ট করা বিষয়ে আলোচনায় সম্মত হয়েছে মার্কিন প্রশাসন। কার্যত কিন্তু এই পথ ধরে অগ্রসর হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই তাদের।

পরবর্তী, একবিংশ শতাব্দীতে, নিউক্লিয়র অস্ত্র বিলোপ সম্পর্কে মার্কিন ধারণার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন পল নিৎশে, তাতে এই সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়। তাদের

ধারণা অনুসারে ব্যাপারটা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ প্রথম পর্যায় অন্তত দশ বছর স্থায়ী হবে। এই পর্যায়ে প্রতিশোধাত্মক আক্রমণের ভয়ই যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখবে, কেননা এর কোনো বিকল্প নেই। আমেরিকা 'এস ডি আই'-এর চৌহদ্দির মধ্যে গবেষণা চালিয়ে যাবে। রূপান্তরকালীন পর্বে, যা হয়তো কয়েক দশক স্থায়ী হবে—উভয় পক্ষই প্রথম আঘাতের মোকাবিলা করার মতো অস্ত্রের বিকাশ ঘটাবে, পরীক্ষা করবে এবং তা স্থাপন করবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে, নিৎশের মতে, আমেরিকার যদি উপযুক্ত কৃৎকৌশলগত ও রাজনৈতিক সামর্থ্য থাকে তাহলে আশা করা যায় সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র সম্ভার শূণ্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যার অস্ত্র প্রতিযোগিতা খর্ব করার এবং নিউক্লিয়র অস্ত্রবিলোপের কোনো প্রকৃত কর্মসূচী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। এ-ব্যাপারে আমেরিকার যত কিছু বাগাড়ম্বর তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং সেই সঙ্গে আগ্রাসনের হাতিয়ার নির্মাণ এবং স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণের সামর্থ্য বাড়িয়ে যাওয়া।

বিনা বাধার আগ্রাসন চালিয়ে যাবার আশায় আমেরিকা সোভিয়েত নিউক্লিয়র অস্ত্রের মূল্য হ্রাসের কর্মসূচী চালিয়ে যাবে আর সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের প্রত্যাঘাত হানার নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাস করবে এমনটা কোনো মতেই আশা করা যেতে পারে না। মোটামুটি সামরিক রণনৈতিক সমতার পরিবেশে, কোনো পক্ষ যদি অন্য পক্ষের অস্ত্রকে 'অর্থহীন' বা 'সেকেলে' করে দেবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে তাহলে অন্য পক্ষ তাদের একাজে সহায়তা করবে এরূপ আশা করা উচিত নয়। পরন্তু, সে বাধ্য হবে সর্বপ্রকারে তাদের বিরুদ্ধে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাস করুক—এই দাবির কার্যত একটাই লক্ষ্য থাকতে পারে ঃ মার্কিন রণনীতিবিশারদদের প্রথম আঘাত হেনে নিরস্ত্র করে ফেলার উন্মাদ ধারণাকে কার্যে পরিণত করা সহজ করে দেওয়া এবং তারপর মহাকাশ বর্মের আড়ালে আত্মগোপন করে প্রত্যাঘাত এড়ানোর চেষ্টা করা। ওয়াশিংটন ও অন্যান্য 'ন্যাটো' রাজধানীগুলি ভালো করে জেনে রাখুক, সোভিয়েত ইউনিয়ন কাউকেই তার উপর সামরিক প্রাধান্য অর্জন করতে দেবে না। তথা-কথিত স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভের ব্যাপারে যে ধরনের জোর তৎপরতা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাসের আহ্বান নিছক বাগাড়ম্বর।

উপসংহার

মহাকাশ কৃৎকৌশলের উত্তুঙ্গ বিকাশ, সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশ ব্যবহারের সুযোগ, আর এই সুযোগ ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একরোখা প্রয়াস—এ-সব মিলিয়ে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মহাকাশের সামরিকীকরণ এড়ানো আমাদের যুগের সবচেয়ে জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাকাশ অস্ত্রের বিকাশ, যদি না তা নিষিদ্ধ করা হয়, তা হলে তা হয়ে দাঁড়াবে একটা বড়ো রকমের স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী উপাদান এবং অনিয়ন্ত্রিত অস্ত্র প্রতিযোগিতার অনুঘটক।

ওয়াশিংটনের বিপজ্জনক মহাকাশ সামরিকীকরণ পরিকল্পনা মানবজাতির স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলবে। তাই অত্যন্ত দেরী হয়ে যাবার আগেই শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলিকে এই নতুন বিপদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে। মিষ্ট আশ্বাস-বাণীর আড়ালে অপরিবর্তনীয় অবস্থা সৃষ্টির আগেই কিছু করতে হবে।

মহাকাশে বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবং পৃথিবী থেকে মহাকাশের লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করায় আহ্বান জানাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যে কোনো প্রকারের অস্ত্র—তা প্রচলিত অস্ত্রই হোক বা নিউক্লিয়র, লেসার, কনিকা রশ্মী বা অন্য কোনো প্রকারের অস্ত্র কক্ষপথে প্রেরণ করা চলবে না বা যাত্রীবাহী বা যাত্রীহীন কোনো মহাকাশ ব্যবস্থায় স্থাপন করা চলবে না। কোনো প্রকারের মহাকাশ অস্ত্র নির্মাণ, পরীক্ষা বা স্থাপন করা চলবে না—তা সে ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যই হোক বা উপগ্রহ-বিরোধী উদ্দেশ্যেই হোক বা পৃথিবী বা আকাশে লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্যই হোক। এই ধরনের যে সব অস্ত্র এখন আছে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

যদি সমস্ত ধরনের মহাকাশ অস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবস্থার (স্ট্র্যাটেজিক ও মাঝারি পাল্লার) বড়ো রকমের হ্রাস, এমনকি সম্পূর্ণ ধ্বংস করার প্রস্তাবে সম্মত হতে প্রস্তুত, অবশ্যই পরস্পরের সমতা ও সমান নিরাপত্তার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে। আজকের দিনে নিউক্লিয়র অস্ত্রে সীমিতকরণ ও হ্রাসের প্রশ্নটি মহাকাশ অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের প্রশ্ন থেকে আলাদা করে সমাধান করা সম্ভব নয়। নিউক্লিয়র আর মহাকাশ অস্ত্রের সমস্যাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর আলোচনার মধ্যেমে তার মীমাংসার জন্য একই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। আর মহাকাশ অস্ত্রের প্রশ্নটির মীমাংসাই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। মহাকাশ অস্ত্রের বিকাশ ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত এবিএম

চুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে আলোচনার বিষয় এবং লক্ষ্য সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তারও বিরোধী। এবিএম চুক্তির বিরুদ্ধে হাত তুললে তা বল্গাহীন অস্ত্রপ্রতিযোগিতার দ্বার খুলে দেবে, ফলত বর্তমান চুক্তিগুলি বিপর্যস্ত এবং ভবিষ্যতে নতুন চুক্তি সম্পাদন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

এবিএম চুক্তিকে রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ এই চুক্তির ভাগ্য নির্ভর করছে রেগন প্রশাসন 'তারকা যুদ্ধ' প্রকল্প পরিত্যাগ করবে কিনা তার উপর। এবিএম চুক্তিকে বাঁচিয়ে না রাখলে এবং মহাকাশের সামরিকীকরণ নিষিদ্ধ না হলে নিউক্লিয়র অস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনা হয়ে দাঁড়াবে অর্থহীন এবং তা থেকে কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

যদি যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশের সামরিকীকরণ শুরু করে এবং এভাবে বর্তমান রণনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাহলে সেই সমতা ফিরিয়ে আনার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। এই ব্যবস্থা প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক অস্ত্র দুই-ই হতে পারে। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল সেরগেই সোকোলোভ বলেছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই কর্মপন্থাই গ্রহণ করবে যা তার প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের স্বার্থানুগ, ওয়াশিংটনের ভদ্রলোকেরা যে ব্যবস্থা নিলে খুশী হবেন তা নয়।...সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের পক্ষে যতটা বিপদ সৃষ্টি করা হবে আমাদের ব্যবস্থা তার উপযুক্ত হবে।'

ওয়াশিংটন ভুরি ভুরি 'যুক্তি' আবিষ্কার করেছে—সবই ছেঁদো যুক্তি অবশ্য, তবু যুক্তি—তাদের 'তারকা যুদ্ধ' প্রকল্পের সাফাই গাইবার যুক্তি। তবে একটা বিষয়ে তারা কোনো কথাই বলতে পারে নি। বলার কিছু নেইও, কেননা বিশ্বাসযোগ্য কোনো কথা বলতে গেলেই তাদের সমস্ত প্রচার কাঠামোটিই ভেঙে পড়বে। এই কাঠামো 'স্ট্র্যাটেজিক ইনিসিয়েটিভকে' ঘিরে কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

প্রশ্নটি স্বাভাবিক। ১৯৮৫ সালের ৮ জানুয়ারি জেনিভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁচেছিল। কীভাবে সে তা মেনে চলবে এবং এ-ব্যাপারে সে ঠিক কি করবে? এ পর্যন্ত বিশ্ব এ-ব্যাপারে ওয়াশিংটনকে কিছু বলতে শোনে নি। তবু শেষ পর্যন্ত তাকে কিছু বলতেই হবে।

বর্তমানে যে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা চলছে এবং মহাকাশের সামরিকীকরণ যদি করতে দেওয়া হয় তাহলে প্রবলতর বেগে যে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা শুরু হবে তার মাত্রা

সম্পর্কে পাঠকদের একটি বিষয়মুখী মূল্যায়ন এখানে দেওয়া হয়েছে। মহাকাশে মার্কিন সামরিক পরিকল্পনা মানবজাতির জন্য যে বিপদ ডেকে আনছে তার মাত্রা অনুধাবন করতে কোনো রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

প্রেসিডেণ্ট রেগনের "তারকা যুদ্ধ" কর্মসূচী সম্পর্কে প্রত্যেককে কোনো-না-কোনো অবস্থান গ্রহণ করতেই হবে। কারোর পক্ষেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব নয়; কেননা প্রশ্নটা হল যুদ্ধ ও শান্তির—আর তাই জীবন ও মৃত্যুর।

কোন্ অবস্থান গ্রহণ করা উচিত তা স্থির করতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সাহায্য করতে পারে:

যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের স্তূপ কি গড়ে ওঠেনি? যদি নিউক্লিয়র তরবারি ছাড়াও আরোও ভয়াবহ মহাকাশ তরবারি যদি পৃথিবীর মাথার উপর ঝুলতে থাকে তাহলে কি জনসাধারণের অবস্থার কোনো উন্নতি হবে (বা তাদের নিরাপত্তা বাড়বে)?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব মতো নিউক্লিয়র অস্ত্রভাণ্ডার স্ফীত করে ঐ অস্ত্র ধ্বংস করা কি সম্ভব?

যুক্তরাষ্ট্র যার নাম দিয়েছে 'স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ' তাতে অন্য দেশগুলিকে যদি টেনে আনা হয় তাতে তাদের কোনো লাভ হবে কি?

এই প্রকল্পে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তাতে আমেরিকার জনসাধারণ ও পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে?

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা, যাঁদের মধ্যে আমেরিকান বিজ্ঞানীও আছেন, যখন বলেন 'নিশ্ছিদ্র' ক্ষেপণাস্ত্রবিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয় তখন কি তারা ভুল কথা বলেন?

এই পুস্তিকায় যেসব তথ্য উপস্থিত করা হল, যাঁরা সেগুলিকে অবিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখবেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন জেনিভাতে মহাকাশ ও নিউক্লিয়র অস্ত্র সম্পর্কে যে সোভিয়েত-মার্কিন আলোচনা চলছে তাতে ধরাছোঁয়ার মতো সাফল্য অর্জিত হলে ঘটনার গতি সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া যেত।

আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রকে তার মতিগতি বদলাতে হবে।

তাহলে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য চুক্তিতে পৌঁছনোর সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার করণীয় করতে প্রস্তুত।

রাসায়নিক যুদ্ধ নিষিদ্ধকরণ আবশ্যিক

আনাতোলি কুন্তসেভিচ
গেন্নাডি স্টাখ

রাসায়নিক অস্ত্রাদি ঃ সাধারণ ধারণা

কিছুকাল আগে পর্যন্ত রাসায়নিক অস্ত্রাদি বলতে বোঝাত সেইসব অস্ত্রাদি যেগুলো কেবলমাত্র মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোত। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যাপক রাসায়নিক যুদ্ধ চালিয়েছিল (১৯৬১-১৯৭১), যেখানে রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হোত কেবলমাত্র মানুষকেই নয় তাদের জৈবিক পরিবেশকেও ধ্বংস করার জন্য, একটা সমগ্র রাষ্ট্রের শিল্প ও কৃষির কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করার জন্য এবং এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবার জন্য, তার অভিজ্ঞতা আধুনিক রাসায়নিক যুদ্ধের ধারণাটিকেই আরও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করতে আমাদের বাধ্য করে। এটা স্পষ্টতই আরো সঠিক বলে মনে হবে যদি আধুনিক রাসায়নিক অস্ত্রাদিকে ব্যাখ্যা করা যায় সেইসব অস্ত্র হিসাবে যাদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা—যেটা রাসায়নিক শক্তির ক্ষতিকারক ধর্মের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল—নিয়োজিত হয় মানুষের বিপক্ষে, প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপক্ষে, সমগ্র জীবমণ্ডলের বিপক্ষে।

রাসায়নিক অস্ত্রাদিতে আছে বিষাক্ত শক্তি—সামরিক উদ্দেশ্যে সমস্ত গাছপালা ধ্বংস করার জন্য রাসায়নিক শক্তি ; আছে রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ, সেই সঙ্গে পরিবহণ-যান, যন্ত্রপাতি ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা।

রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হলে সৃষ্টি হয় একটি রাসায়নিক সংক্রামণের এলাকা অর্থাৎ এমন একটি এলাকা যা বিষাক্ত দ্রব্যে এত বেশী পরিমাণে পরিপূর্ণ যে সেই এলাকার সমস্ত মানুষ, গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এলাকা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা নির্ভর করে কী ধরনের ও কী পরিমাণে বিষাক্ত শক্তি বা দ্রব্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিভাবে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, সংক্রমণের গভীরতা কতটা (এলাকার প্রতি বর্গমিটারে ক্ষতিকারক শক্তির পরিমাণ), আবহাওয়ার অবস্থা এবং ভূখণ্ডের বৈশিষ্ট্যের উপর। আধুনিক ক্ষতিকারক যুদ্ধাস্ত্রগুলি ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের (কয়েক কুড়ি থেকে কয়েক শত বর্গ-কিলোমিটার পর্যন্ত) সংক্রামক এলাকা সৃষ্টিতে সক্ষম। যখন রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণগুলি কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে অথবা যখন ক্ষতিকারক শক্তিগুলিকে মহাশূন্য থেকে ছিটিয়ে দেওয়া হয়, তখন তারা প্রাথমিক ভাবে দূষিত বাতাসের একটা মেঘ তৈরী করে যার মধ্যে থাকে বিষাক্ত বাষ্প ও ধোঁয়াশা। যখন এই প্রাথমিক মেঘ বায়ুবাহিত হয় তখন এটা ভূখণ্ড এবং এর উপরের সমস্ত বস্তুকে দূষিত এবং সংক্রামিত করে। তারপর বিষাক্ত শক্তির অংশবিশেষ ধীরে ধীরে ভূখণ্ড এবং

বস্তুসমূহের উপর থেকে বাষ্পীভূত হয়ে দ্বিতীয় একটি দূষিত বায়ুর মেঘাবরণ তৈরী করে। দূষিত বায়ুর এই প্রাথমিক ও দ্বিতীয় মেঘাবরণ বায়ুবাহিত হয় এবং একশ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বসবাসকারী মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে।

বিষাক্ত শক্তি কলুষিত করে বাতাসকে, গাছপালা সমেত ভূখণ্ড, সকল বস্তু, জলভাণ্ডার ও সমস্ত খাদ্যসামগ্রীকে। সমগ্র পরিবেশটাই হয়ে ওঠে·মানুষের কাছে একটা বিপদের উৎস এবং এই অবস্থা সাধারণত বহুদিন ধরে বজায় থাকে। এই কারণেই রাসায়নিক অস্ত্রাদি সেই বিশেষ ধরনের আয়ুধ বলে পরিচিত যা এলাকার লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করে এবং বাতাসকে করে কলুষিত। রাসায়নিক অস্ত্রাদির একটা ভেদকারী প্রভাব আছে, কারণ বিষাক্ত শক্তির বাষ্প এবং ধোঁয়াশা বিভিন্ন ধরনের অ-বায়ুরোধ সামরিক লৌহদ্রব্যাদি, ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মানকার্য, অট্টালিকা ও তাদের ভিত্তি এবং অন্যান্য এলাকার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। কেউ যদি এই বিষাক্ত শক্তির প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায় তবে তার প্রয়োজন বিশেষ চাপযুক্ত আশ্রয়স্থল অথবা ব্যক্তিগত রক্ষণ ব্যবস্থা (যথা গ্যাস-মুখোশ ও চর্মরক্ষার উপায়)।

বেশির ভাগ বিষাক্ত শক্তির কোনো রঙ অথবা গন্ধের বাহ্যিক লক্ষণ নেই। তাদের ধরা শক্ত। এই কারণে আগ্নেয়াস্ত্র বা নিউক্লিয়র ও রোগজীবাণুবাহী অস্ত্রের সঙ্গে এই সমস্ত বিষাক্ত শক্তি আচম্বিতে ও গোপনে ব্যবহার করা চলে। যার ফলে তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াটা বেশ শক্ত হয়ে পড়ে এবং এর ফল হয় জনসাধারণের সার্বিক ধ্বংস, বিশেষ করে অরক্ষিত অসামরিক মানুষজনের। আক্রান্ত ব্যক্তিদের আঘাতের লক্ষণের বিভিন্নতা ও জটিলতা এবং বায়ু ও ভূখণ্ডের দূষণ ঘটার ফলে মেডিকেল সহায়তা ও আক্রান্তদের চিকিৎসা বাধাগ্রস্ত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার ফলে তাদের উপর ওই রাসায়নিক অস্ত্রাদির প্রত্যক্ষ দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত বৃদ্ধি পায়।

এই বিষধর শক্তির মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণ যার উদ্দেশ্যই হল মানুষ, প্রাণী এবং গাছপালার উপর ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করা। আধুনিক বিষধর শক্তিগুলি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত—স্নায়ুপ্রদাহী, ফোসকা-উৎপাদনকারী, শ্বাসরোধকারী, সাধারণ বিষ, মনোরাসায়নিক, যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক শক্তি।

পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদির মধ্যে আছে রাসায়নিক শক্তিসমূহ যা সামরিক প্রয়োজন মিটাতে উদ্ভিদকূলের ধ্বংসসাধন করে। এগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে লতাবিনষ্টকারীরা—যারা লতা ও চারার বৃদ্ধি ব্যাহত করে—এবং নিষ্পত্রকারীরা—যা উদ্ভিদকে ধ্বংস ও নিষ্পত্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত হল মৃত্তিকা বন্ধ্যাত্বকারীরা যাদের কাজ

হল মাটিকে দূষিত করা এবং চারা ও লতার বৃদ্ধির গতিকে ব্যাহত করা এবং অবশেষে গাছপালার বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে রোধ করা। রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার—যা গাছপালার ধ্বংসসাধন করে—দুটি লক্ষ্য অনুসরণ করে। প্রথমতঃ, লক্ষ্যবস্তুকে উন্মোচন করা এবং দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যবস্তুর যোগানের উৎসের উপর আর্থিক ক্ষতি-সাধন করা অথবা সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা। একই সঙ্গে এটি মানুষ ও জীবজন্তু উভয়েরই ক্ষতি সাধন করে।

মানুষ, জীবজন্তু এবং গাছপালার ক্ষতি সাধন এবং ভূখণ্ডকে কলুষিত করবার আগে এই বিষধর শক্তিগুলিকে লক্ষ্যবস্তুর উপর ফেলতে হবে এবং বাষ্পে ও ধোঁয়াশায় (কুয়াশা অথবা মিহি ধুলো) অথবা যতটা সম্ভব বৃহৎ এলাকার উপর ক্ষুদ্র বিন্দুতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রাসায়নিক আক্রমণের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যুদ্ধ বিমান পোত (রাসায়নিক বিস্ফোরক, ক্যাসেট, বিমানপোত, সেচনার্থে রাসায়নিক ট্যাংক), কামান (রাসায়নিক গোলা, মাইন ও রকেট), ক্ষেপণাস্ত্র (রাসায়নিক ক্ষেপণাস্ত্র ও উড়ন্ত বিস্ফোরক), এবং স্থলভাগের যন্ত্রব্য ব্যবহৃত বস্তু (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক বিস্ফোরক, স্থল-মাইন, রাসায়নিক গ্রেণেড, বিষাক্ত ধূম্রপূর্ণ বাষ্প এবং ধোঁয়াশা উৎপাদন যন্ত্র)।

রাসায়নিক আক্রমণের সবথেকে উপযোগী প্রধান পথ হল রাসায়নিক ক্ষেপণাস্ত্র, বিমানপোত, রাসায়নিক সেচন-ট্যাংক, রাসায়নিক বায়বীয় বিস্ফোরক, অসংখ্য উৎক্ষেপকের উপর রাসায়নিক রকেট এবং ভূগর্ভস্থ কামানের রাসায়নিক গোলা।

যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব প্রাচীন যুগেও সামরিক উদ্দেশ্যে রাসায়নিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করার ঘটনা আছে। যাইহোক, প্রথম শক্তিশালী ব্যাপক রাসায়নিক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। ১৯১৫ সালের ২২শে এপ্রিল তারিখে বেলজিয়ান নগর ইপ্রেস-এর কাছে জার্মানরা এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। এইভাবেই শুরু হয়েছিল।

১৯১৪ সালে ফ্রান্সকে দ্রুত পরাজিত করার জার্মান পরিকল্পনার ব্যর্থতা পশ্চিম সীমান্তে একটা সৈনাপত্যসংক্রান্ত সমতার জন্ম দিল ; এবং উভয় পক্ষ স্থানিক যুদ্ধ চালাবার দিকে চলে গেল। ইংলিশ চ্যানেল থেকে সুইজারল্যাণ্ড পর্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ বিস্তৃত হল। সীমান্তের প্রতি কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হল এবং উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মেশিন গান ও কামান বসিয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হল। শত্রুপক্ষের রক্ষণব্যূহ ভেদ করার প্রচেষ্টার ফল হল আক্রমণকারীর মারাত্মক ক্ষতি। অতএব, শক্তিশালী এই রক্ষণব্যূহ ভেদ করার নূতন নূতন পথ বের করার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং পথও একটা বের হল। আই.

জি. ফারবেন ইনডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্ল ড্যুইসবার্গ বিষাক্ত রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেন।

১৯১৫ সালের ২২শে এপ্রিল বিকাল ৫টায় জার্মানদের দিক থেকে ইপ্রেস-এর উত্তরদিকে ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার চওড়া সীমান্তের উপর একটা ধূসর সবুজ রংয়ের কুয়াশা উড়ে এল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওই কুয়াশা সমগ্র ফরাসী এলাকা ঘিরে ফেলল। যদিও ফরাসীদের একটা বায়বীয় আক্রমণের পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছিল, এইরূপ নূতন ধরনের আক্রমণের সম্মুখে তারা হতবাক ও নিশ্চল হয়ে পড়েছিল। বিষাক্ত কুয়াশার ঢেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরা ঢলে পড়ল উন্মুক্ত প্রান্তরে, পরিখার এবং ভূগর্ভস্থ খাদের মধ্যে। সৈনিকেরা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অন্ধের মতো তাদের অবস্থান থেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে জার্মানরা গ্যাস-বাক্স থেকে ১৮০ টন ক্লোরিন ছড়াল। এই গ্যাসীয় আক্রমণের ফলে আহত হল ১৫,০০০ মানুষ, যার মধ্যে ৫০০০ জন মারা গেল পরবর্তী দু'দিনে। ৮ কিলোমিটার সীমান্ত ভেঙ্গে গেল এবং ইংলিশ-চ্যানেল যাবার রাস্তা জার্মান সেনাবাহিনীর কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। মনে হয়, পরিকল্পনার স্তরে জার্মানরা তাদের এই অভূতপূর্ব এবং নজীরবিহীন সাফল্যের কথা আশাও করতে পারেনি, তাই তারা দুটো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমতঃ, ক্লোরিন যথেষ্ট কম মাত্রায় ছাড়া হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, রাসায়নিক আক্রমণের এলাকায় সাফল্যের সুযোগ নেবার জন্য যথেষ্ট সৈন্যবাহিনী মোতায়েন ছিল না। তার ফলে গভীর স্তরবিন্যস্ত ফরাসী প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা টিকে থাকল। যাইহোক, প্রথম বৃহদাকার রাসায়নিক আক্রমণের মর্মান্তিক পরিণতি সারা পৃথিবীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সাধারণভাবে তাই মনে করা হয় যে ওই রাসায়নিক আক্রমণই জন্ম দিয়েছিল আধুনিক রাসায়নিক মারণাস্ত্রসমূহের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত বিষাক্ত শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলির সামগ্রিক সংখ্যা ৪৫-এর কম ছিল না—যার মধ্যে ১৮টি ছিল প্রাণঘাতী এবং ২৭টি যন্ত্রণাদায়ক। ওই প্রাণঘাতী শক্তিগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল শ্বাসরোধকারী পদার্থগুলি—ক্লোরিন, ফস্‌জীন, ডাইফস্‌জীন এবং অন্যান্য সাধারণ বিষাক্ত শক্তিসমূহ—প্রুসিক অ্যাসিড, সায়ানোজেন ক্লোরাইড এবং ফোস্কাকারী শক্তিসমূহ—ইপ্‌রাইট ও অন্যান্য। যন্ত্রণাদায়ক শক্তিগুলির মধ্যে ছিল, বেন্‌জিল ব্রোমাইড্‌, ব্রোমাইসটোন, ইথিলিওডিনয়্যাসিটেট ইত্যাদি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থের সামগ্রিক পরিমাণ হল ১,২৫,০০০ টন। এই 'নিঃশব্দ মৃত্যু' আনয়নকারী অস্ত্র ১৩ লক্ষ মানুষকে আহত করেছিল। তার মধ্যে ১ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে "সেরা" ছিল ইপ্রাইট।

এইসব বিষাক্ত পদার্থ তরলীকৃত ধোঁয়াশা বাষ্পাকারে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শুধু চোখ ও ফুসফুস নয়, শরীরের চামড়াও। এবং তার ফলে গ্যাস-মুখোশ অকেজো হয়ে পড়েছিল। ইপ্রাইট থেকে মানুষ ও জীবজন্তুর চর্মরক্ষার ব্যাপারটা একটা বিরাট বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ইপ্রাইট ব্যবহারের ফলে হতাহতের মোট সংখ্যা ছিল অতি বিরাট।

সব মিলিয়ে ৯০ লক্ষ ইপ্রাইট বোমা এবং প্রায় ৫,০০,০০০ লক্ষ সাধারণ বোমা, যার মধ্যে ভয়াবহ বিস্ফোরকও অন্তর্ভুক্ত ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ মত্যুসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,০০,০০০ এবং ১ কোটি। অন্যভাবে বলা যায়, ইপ্রাইট বোমার ক্ষেত্রে প্রতি মৃতের জন্য বরাদ্দ ছিল ২২.৫টি বোমা এবং বিস্ফোরকের ক্ষেত্রে, মাথাপিছু ৫০০০টি অথবা তার ২০০গুণ বেশি বোমা।

তাহলে আনুপাতিক হিসাবটা দাঁড়ালো ২০০ ঃ ১, যার তাৎপর্য সহজেই বোঝা যায়। হিসাবটাকে অবশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করতে হবে। যাইহোক, বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এই ব্যাপারটায় একমত হয়েছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত সাধারণ বোমার চেয়ে রাসায়নিক বোমার কার্যকারিতা ছিল কমপক্ষে পাঁচগুণ বেশী। এর ফলে যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের সামরিক অধিপতিরা রাসায়নিক অস্ত্রের প্রতি তাদের ধারণা নাটকীয়ভাবে বদলে ফেলল। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল জার্মানরা সামগ্রিকভাবে যত বোমা বানিয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশী বোমা হল রাসায়নিক। ১৯১৮ সালে যুদ্ধের জন্য যখন গোলাবারুদের ফরমাশ দেওয়া হল তখন মার্কিন সামরিক কর্তা অনুরোধ করলেন যে রাসায়নিক বোমার পরিমাণ হবে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ।

মার্কিনী সমর—রাসায়নিকের সক্ষমতা

১৯১৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী মার্কিন সৈন্যদের উপর ফসজীন বোমা ব্যবহার করা হল, রাসায়নিক আক্রমণ চালানো হল। প্রত্যুত্তরে আমেরিকানরা রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রসমূহের ব্যবহার শুরু করল।

রাসায়নিক অস্ত্রাদির জন্য উত্তরোত্তর ফরমাশ পেশ করার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষাক্ত শক্তি তৈরীর একটি বিরাট শিল্প গড়ে উঠল। বড় বড় কারখানার মধ্যে অন্যতম ছিল এজ্‌উড ও বাফালো অস্ত্রাগার। ১৯১৮-র শেষ দিক নাগাদ তাদের দৈনিক উৎপাদন ছিল কেবলমাত্র ইপ্রাইট বোমার ক্ষেত্রেই ১৫৫ টন।

এই রাসায়নিক অস্ত্রের কার্যকারিতাটা মার্কিনী সমরবিদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দশকগুলিতে এই ধরনের অস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক অস্ত্রাদি বিবেচিত হতে লাগল সবচেয়ে আশাপ্রদ গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে—বাস্তবিকপক্ষে যার উন্নতিকরণে কোন সীমারেখা টানা যেত না, যেমন কোন সীমারেখা টানা যায় না জীবন্ত প্রাণীর রহস্য জানার ক্ষেত্রে। তাই দেখা যায়, ১৯১৪ সালে একটা মানুষকে হত্যা করার জন্য যেখানে ১০০০ মিলিগ্রাম ইপ্রাইটের প্রয়োজন ছিল, সেখানে ১৯৬০-এর দশকে হাজার হাজার গুণ বেশী কার্যকরী ছিল আমেরিকান ভি-এক্স। আবার খাদ্যাদি বিষণের যে জৈব বিষ তা ছিল এই ভি-এক্সের থেকে হাজার গুণ বেশী কার্যকরী। সত্যিই, এই অগ্রগতি প্রচণ্ড।

৫০ বছর ধরে মার্কিন কংগ্রেস যুদ্ধে শ্বাসরোধকারী, বিষাক্ত অথবা অন্যান্য গ্যাস ব্যবহার এবং রোগজীবাণু পদ্ধতিমূলক যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ১৯২৫ সালের জেনিভা চুক্তিকে বলবৎ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মার্কিন সমর-রাসায়নিক নিগমের প্রধান জেনারেল অ্যামস ফ্রীস বলেছিলেন যে জেনিভা চুক্তি গ্রহণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমর-প্রস্তুতি বিরাট আঘাত পাবে। ১৯২০ সালে তিনি ঘোষণা করলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জের চেয়ে বেশি রাসায়নিক প্রস্তুত করতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যোগান দিতে সক্ষম। মার্কিন সমর-রাসায়নিক নিগমের সৃষ্টি মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন পেল। মার্কিন সমর পুস্তিকায় রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্রসমূহকে সম্পূর্ণ বৈধ ধরনের অস্ত্র বলে গণ্য করা হল এবং সেনাধ্যক্ষদের সেগুলো ব্যবহার করার অনুমতি ও অধিকার দেওয়া হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরাট সমর-রসায়নিকের ক্ষমতা ছিল। এটা জানা গেছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন সৈন্যরা জাপানের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে তাদের নৌবহরের উপর, এই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। পরীক্ষামূলকভাবে জন্তুজানোয়ার বোঝাই জাহাজের উপর এই বিষাক্ত শক্তির বোমা ফাটানো হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এই রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহার শেষ পর্যন্ত করেনি তার কারণ নূতন এক প্রকার অস্ত্রের আবির্ভাব—তা হল পরমাণু অস্ত্র যা তারা প্রয়োগ করেছিল জাপানের দুটি নগরী হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর।

সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রধান বিষাক্ত ও ক্ষতিকর শক্তিগুলো প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হচ্ছিল সেগুলো হল ইপ্রাইট, লিউইসাইট এবং ফসজীন। ওগুলো ছাড়াও সামরিক প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করছিল নাইট্রোজেন ইপ্রাইট, প্রুসিক অ্যাসিড, সায়ানোজেন ক্লোরাইড, ক্লোরাসেটোফেনান এবং অ্যাডামসাইট। যুদ্ধের বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরবরাহ করা হয়েছিল মোট ১,৩৫,০০০ টন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ৭৯,০০০ টনেরও বেশী ইপ্রাইট, ২০,০০০ টন লিউইসাইট এবং ১৮,০০০ টনেরও বেশী ফসজীন।

এইসব ক্ষতিকর পদার্থ উৎপাদনের জন্য শিল্পের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল চারটি রাষ্ট্র মালিকানার সমর-রাসায়নিক অস্ত্রাগারে—এজউড, পাইন-ব্লাফ, রকি-মাউন্টেন্স্ এবং হান্টসভিল। এছাড়াও আরো এক ডজন অথবা তারও বেশী রাষ্ট্র পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানে ওইসব বিষাক্ত, আগ্নেয় বোমা, অসংক্রামক শক্তিসমূহ এবং অরাসায়নিক প্রতিরক্ষা সরঞ্জামসমূহ তৈরী হচ্ছিল। উপরিল্লিখিত কারখানাগুলির মধ্যে বেশীরভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী ও চালু হয়েছিল।

পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবের ফলে রাসায়নিক সমরাস্ত্রের উন্নতি থেমে থাকেনি ; বরং উল্টোটাই ঘটল। যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাভ করল ফ্যাশিষ্ট জার্মানিতে তৈরী-হওয়া এক নতুন নার্ভ টাইপ সংশ্লেষিত বিষাক্ত পদার্থের (টাবুন, সারিন, সোমান) পেটেণ্ট ও কৃৎকৌশলের দলিল এবং সেগুলিকে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হল। মনে হয় এটাই ছিল একটা কারণ যার জন্য ১৯৪৭ সালে মার্কিন কংগ্রেস মেনে নিতে গররাজী হয়েছিল ১৯২৫ সালের জেনিভা চুক্তি যেটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ (১৯২৮ সালে) চল্লিশটিরও বেশী দেশ সমর্থন এবং অনুমোদন করেছিল।

এইসব নূতন এবং অধিকতর কার্যকরী ক্ষতিকর শক্তির আবির্ভাবের ফলে পুরাতন ক্ষতিকর শক্তিসমূহ—যেমন নাইট্রোজেন ইপ্রাইট, লিউইসাইট, প্রুসিক অ্যাসিড এবং সায়ানোজেন ক্লোরাইড—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর-রাসায়নিক অস্ত্রাগার থেকে সরিয়ে

ফেলা হল। ওই একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তড়িৎ গতিতে বাড়াতে লাগল সারিন-এর উৎপাদন—যার সাংকেতিক নাম হল জি-বি।

ইতিপূর্বে ১৯৪৭ সালে জি-বি (সারিন) নামক এই ক্ষতিকর পদার্থ তৈরী করার জন্য একটা কারখানা শুরু করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। কারখানাটি স্থাপিত হবে মাস্‌ল্ শোয়াল্‌জ (আলবামা) নগরীতে এবং সারিন প্রস্তুতের জন্য প্রধান মধ্যবর্তী দ্রব্যের উৎপাদন হবে। কারখানাটি তৈরী হল ১৯৫৩ সালে। কিন্তু প্রযুক্তিগত পদ্ধতির উন্নতির জন্য তার কাজ চলতে থাকল ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত। তারপর কারখানা চলল তিন থেকে চার বৎসর পর্যন্ত। যখন ক্ষতিকারক স্নায়বিক পদার্থসমূহের সংশ্লেষের জন্য অন্তর্বর্তী দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য মজুত সৃষ্টির কর্মসূচী বা পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়ে গেল, কারখানাটিকে তখন অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলে রাখা হল, যদিও এখনও পর্যন্ত তার উৎপাদন ক্ষমতার প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামই রয়েছে।

অন্তর্বর্তী উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে, যা মাস্‌ল্ শোয়ালজ সরবরাহ করেছিল, সারিন সংশ্লেষের শেষ ধাপের কাজ সম্পাদন করা হয়েছিল অন্য একটি কারখানায় যা তৈরী হয়েছিল ১৯৫৪ সালে রকি মাউণ্টেনজ অস্ত্রাগারে (কোলোরাডোর ডেনভারের সন্নিকটে)। ক্ষতিকারক পদার্থসমূহকে কামানের গোলা, বায়বীয় বোমা, মাইন, উক্ত বিস্ফোরক স্থল-মাইনের মধ্যে ভরবার জন্য সেখানে বিশেষ 'অ্যাসেম্বলি লাইন' ছিল (ব্যাপক উৎপাদনের যে অবস্থায় বা স্তরে যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়)।

এই কারখানায় উৎপাদনের সীমারেখা সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছেছিল ১৯৫৪-র মার্চ থেকে ১৯৫৭-র অগাস্ট মাস পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে এই কারখানায় প্রায় ৫০,০০০ টন বিষাক্ত পদার্থের সংশ্লেষ ঘটেছিল এবং এই বিরাট পরিমাণ সারিন সামরিক ভাণ্ডারে এবং দীর্ঘ-মেয়াদী মজুত-ভাণ্ডারে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় পেণ্টাগণের এই ক্ষতিকারক শক্তির আর বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, যার ফলে রকি মাউণ্টেনজ অস্ত্রাগারে সারিন-এর উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হল। ওই বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নূতন বিষাক্ত পদার্থের উন্নতির উদ্দেশ্যে তীব্রভাবে গবেষণার কাজে লিপ্ত থাকল। এই ব্যাপারে ডজন ডজন বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি শেষ করা হতে লাগল এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল বিভিন্ন দেশের—যেমন গ্রেট ব্রিটেন, কানাড়া এবং অস্ট্রেলিয়া—সামরিক কর্তৃত্ব এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ১৯৫০ সালের শেষ দিকে ইথারকে কেন্দ্র করে যা ডঃ লারজ ট্যামেলিন সুইডিশ জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন—দ্বিতীয় পর্যায়ের ফস্‌ফর অরগ্যানিক জাতীয় ক্ষতিকারক স্নায়বিক পদার্থ পাওয়া গেল যা ছিল সারিন-এর চেয়ে দশগুণ অধিকতর বিষাক্ত।

এজউড এবং পোর্টন ডাউন অস্ত্রাগারে নূতন ক্ষতিকারক পদার্থের মতো রাসায়নিক যৌগিকের সঙ্গে শত শত মিশ্রণ সংশ্লেষিত হল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচারবিশ্লেষণ করা হল এবং অবশেষে একটি চূড়ান্ত পছন্দে পৌঁছানো গেল একটা শক্তির অনুকূলে যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংকেতিক নাম গ্রহণ করল ভি-এক্স। এই শক্তির একটা ফোঁটা—যা একটা পোস্ত দানার চেয়ে বড়ো নয়—চামড়ার উপর পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে ডেকে আনে।

বাস্তবিকপক্ষে, ওই একই সময়ে ভি-এক্স-এর শিল্পজাত উৎপাদনের প্রযুক্তি উন্নত করা হল। ১৯৫৯ সালে ভি-এক্স (ইণ্ডিয়ানার নিউপোর্টে) উৎপাদনের জন্য একটা কারখানা তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৯৬১ সালে ভি-এক্স প্রস্তুতের জন্য সরকারী পরিচালনাধীন একটা সামরিক রাসায়নিক কারখানা চালু হয়ে গেল। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এটা ভি-এক্স উৎপাদন করল ৫,০০০ টন যার একটা অংশ ব্যবহৃত হল সরাসরি কারখানায় রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ ভরাট করার জন্য। ১৯৬৯ সালে কারখানাটিকে অব্যবহার্য অবস্থায় ফেলে রাখা হল। যাইহোক, মাস্‌ল্ শোয়াল্‌জ্-এর ক্ষেত্রে যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি তখনও সেখানে ছিল সেগুলো অল্প সময়ের মধ্যে নূতন করে উৎপাদন করা সম্ভবপর করল। প্রতি তিন বছর অন্তর মাস্‌ল্ শোয়াল্‌জ্, রকি মাউণ্টেন্‌স্ এবং নিউপোর্ট অস্ত্রাগারে সমস্ত যন্ত্রপাতিকে পরীক্ষা করা হতে লাগল সেগুলোকে চালু অবস্থায় রাখাটা নিশ্চিত করতে।

রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণগুলিকে বোঝাই করা হতে লাগল মুখ্যত সামরিক রাসায়নিক অস্ত্রাগারের কর্মশালায় যেগুলি অবস্থিত ছিল এজউডে (এজউড অস্ত্রাগার, মেরীল্যাণ্ড), পাইন ব্লাফে (পাইন ব্লাফ অস্ত্রাগার, আরকানসাস), ডেনভারে (রকি মাউণ্টেন্‌স্ অস্ত্রাগার, কোলোরাডো) এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য রাষ্ট্র পরিচালনাধীন কারখানায়।

এবারে নির্দিষ্ট ধরনের মার্কিন রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। সেগুলি হচ্ছে মার্কিন সামরিক, নৌ ও বিমান বহরের বিষাক্ত শক্তি এবং রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ।

বর্তমানে মার্কিন সামরিক বাহিনী তিন ধরনের বিষাক্ত শক্তি দ্বারা সজ্জিত—প্রাণঘাতী বিষাক্ত শক্তি, অক্ষমকারী শক্তি এবং যন্ত্রণাদায়ী শক্তি। মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞরা যন্ত্রণাদায়ী শক্তিকে বিবেচনা করল "পুলিশদের বিষাক্ত শক্তি" হিসাবে যেগুলো, যদিও সামরিক অস্ত্রাগারে রক্ষিত ছিল, কিন্তু বলা হল যে, কেবলমাত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা রোধ করার সময়েই ব্যবহৃত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোচীনে যে রাসায়নিক যুদ্ধ চালিয়েছিল তার থেকে প্রচুর প্রমাণ মেলে যে সেখানে অস্তিত্ব ছিল একটা চতুর্থ একদল বিষাক্ত শক্তির যাকে

বলা হয় নিষ্পত্রকারী। রাষ্ট্রপুঞ্জ এটিকে রাসায়নিক যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবেই ধরেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নতি ঘটিয়েছিল বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ এর যেগুলো বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। রাসায়নিক যুদ্ধের প্রয়োজনে মার্কিন অস্ত্রাগারের মধ্যে ভর্তি ছিল একশ ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ যেগুলি সামরিক এবং বিমান বাহিনীকে সরবরাহ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ সামরিক বাহিনীর দরকারে কামানের গোলা ও রকেটের, রাসায়নিক মাইন-এর এবং উচ্চ বিস্ফোরকযুক্ত স্থল-মাইন-এর জন্য রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থ এবং গ্যাস-বাক্স ও গ্রেনেডকে উন্নত করা হল। রাসায়নিক অস্ত্রের উপযোগিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে যোগান দেওয়ার যানের উপর। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে রকেটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে একটা বিরাট কৌশলগত গভীরতা সৃষ্টির ব্যাপারে এলাকার লক্ষ্যবস্তুর উপরে হঠাৎ আক্রমণ হানাটা সম্ভবপর করতে পারে। ওই একই সময়ে তাদের ব্যবহার সব সময় সম্ভবপর ছিল না তাদের উচ্চমূল্য এবং গুলি-গোলার কম দরের জন্য। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরী করল ক্যাসেটের আকারের তিন ধরনের জি-বি রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থ যেগুলো সুকৌশলে পরিকল্পিত মার্কিন সামরিক ক্ষেপণাস্ত্রের উপর ব্যবহৃত হবে এবং যেগুলো প্রায় তখন থেকেই ল্যান্স ক্ষেপণাস্ত্রের উপর ব্যবহৃত নূতন রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থের দ্বারা প্রতিস্থাপিতও হয়েছে।

এলাকার লক্ষ্যবস্তুর উপর রাসায়নিক অস্ত্রের আঘাত হানা হয় ১১৫ মিলি-মিটার ৪৫-রেইল রকেট লঞ্চার M ৯১ দ্বারা।

এই পদ্ধতির জন্য ভি-এক্স অথবা জি-বি দ্বারা পরিপূর্ণ রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ-গুলিকে উন্নত করা হয়েছে; যাদের গুলি-গোলার পাল্লা প্রায় ১১ কিলোমিটারের মত। একটি উৎক্ষেপণ চল্লিশ হেক্টর এলাকাকে আঘাত করতে পারে।

মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে রকেট উৎক্ষেপক, ভূগর্ভস্থ কামান ও মর্টারের দ্বারা নিক্ষিপ্ত রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণের কার্যকারিতা নির্ভর করে প্রথমোক্তের উচ্চমাত্রার নির্ভুলতা, নিক্ষেপণের উচ্চ হার, উচ্চমাত্রার সচলতা ও নিক্ষেপণের সংহতির উপর।

মার্কিন বিমান বাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে—যেমন, রাসায়নিক আকাশী বোমা, রাসায়নিক বায়বীয় ক্যাসেট এবং বিমানবাহী রাসায়নিক সিঞ্চনকারী ট্যাংক। তাদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যবহৃত হতে পারে মার্কিন নৌবহরের বিমান বাহিনীর দ্বারা এবং নৌ-বাহিনীর দ্বারা।

মার্কিন সামরিক বাহিনীও সজ্জিত হয়েছে প্রচুর সংখ্যক রাসায়নিক গ্রেনেড,

ধোঁয়াশা, স্প্রে, রাসায়নিক কার্তুজ ও পেটিকা দ্বারা যেগুলো যন্ত্রণাদায়ক এবং পঙ্গুত্বসৃষ্টিকারী বিষাক্ত শক্তি দ্বারা পূর্ণ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরক রাসায়নিক স্থল-মাইন যেগুলো সামরিক বাহিনী এবং নৌবাহিনীতে যোগান দেওয়া হয় সেগুলো প্রাণঘাতী বিষাক্ত শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর হাতে আছে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত শক্তি যেগুলো সীমিত এবং বিশ্ব উভয়প্রকার যুদ্ধে এবং বিভিন্ন প্রকার সামরিক আক্রমণে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মোটের উপর বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক অস্ত্রসমূহের যে প্রস্তুতি-করণ এবং উন্নতীকরণ চলেছে তা প্রায় ৯০টি রাষ্ট্রচালিত এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে চালু করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত শক্তি প্রস্তুতের ২০টি কারখানা, সামরিক প্রয়োজনে উদ্ভিদ ও পত্র বিনষ্টের ১০টি কারখানা যেখানে রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার ৯টি প্রতিষ্ঠান এবং ৬টি প্রতিষ্ঠান যেখানে ওইসব যুদ্ধোপকরণকে বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে ভর্তি করা হয়। মার্কিনীরাষ্ট্রের ওই বিষাক্ত পদার্থের উৎপাদন ক্ষমতা হল ১,২৭,০০০ টন (যার মধ্যে আছে ৫০,০০০ টন জি-বি, ৫,০০০ টন ভি-এক্স এবং ৬২,০০০ টন ইপ্রাইট)। রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণের বোঝাই সম্বন্ধে বলা যায় যে এর সম্ভাবনা বাৎসরিক ৫০০ লক্ষ ইউনিটের সমান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের সঠিক পরিমাপটা জানা যায় না (এটা গোপন রাখা হয়)। যাইহোক, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের অস্ত্রাগারে আছে ৩০ লক্ষ জি-বি এবং ভি-এক্স কামানের গোলা, কয়েক হাজার ৫০০ এবং ৭৫০ পাউণ্ডের বোমা (জি-বি), লক্ষ লক্ষ দু-গ্যালনের রাসায়নিক উচ্চ বিস্ফোরক স্থল-মাইন এবং প্রায় ১৬০ গ্যালনের ১৫০০ বিমানের রাসায়নিক স্প্রে ট্যাংক (ভি-এক্স)। বর্তমান সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী বোঝাই করা রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণের মোট ওজন হল ১,৫০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ টন। ১৯৮২ সালে পশ্চিম জার্মানীর পত্রিকা 'ডেয়ার স্পীকোল' মন্তব্য করেছিল যে উক্ত পরিমাণ একশ দিন ধরে একটা রাসায়নিক যুদ্ধ চালাতে ৫০টি ডিভিশনের পক্ষে যথেষ্ট এবং যার পরিণামে সমগ্র ইউরোপে প্রাণের অস্তিত্ব বড়ো একটা থাকবে না।

তার আক্রমণমুখী পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো তার রাসায়নিক অস্ত্রাদি পরিত্যাগের কথা চিন্তা করেনি। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় রাসায়নিক অস্ত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত মার্কিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের মূল্যায়ন থেকে।

সাল ১৯১৯ ঃ জেনারেল জন জে. পার্শিং বলেছিলেন, "ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহৃত হবে কি হবে না সেটা একটা অনুমানের বিষয় কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অসাবধানীদের কাছে এমন মারাত্মক হবে যে সেই প্রশ্নটাকে মোটেই আমরা অবহেলা করতে পারি না।"

সাল ১৯৬৪ ঃ জেনারেল জে. এইচ. রথচাইল্ড, একজন মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র হল আগামী দিনের অস্ত্র এবং সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের রয়েছে বিশেষ গুণ এবং শত্রুপক্ষের ব্যক্তি-প্রাধান্য ধ্বংস করার ক্ষমতা।

সাল ১৯৮২ ঃ অ্যামোরেটা এম. হোবার, সামরিক বাহিনীর গবেষণা ও উন্নতি বিভাগের উপ-সহ-সম্পাদক, ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত রাসায়নিক যুদ্ধকে যে কোন সংঘর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা।

"নিঃশব্দ মৃত্যু" ঘটানোর এই বর্বর অস্ত্র মার্কিন সামরিক গুদামে শুধু শুধু পড়ে থাকল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কোরীয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ায়। ওগুলো আবার আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া এবং অন্যান্য দেশের প্রতি-বিপ্লবীদের গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

ইন্দোচীনের দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের রাসায়নিক অস্ত্রের বৃহত্তম পরীক্ষাক্ষেত্ররূপে পরিণত করল। সেইসব স্থানে পেন্টাগণ মানব জাতির বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবহার করেছিল এইসব রাসায়নিক অস্ত্রাদি—সি-এস, সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস, বি-এ-ই এবং বি-জেড।

মার্কিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দাবী অনুযায়ী ওইসব রাসায়নিক শক্তিগুলি সত্যিই কি প্রাণঘাতী নয়?

সি-এস শক্তির ক্ষমতা কতখানি দেখা যাক। প্রতি ঘন মিটারে এই শক্তির ০'০৫ – ০.১ মিলিগ্রামের ঘণীভবন একটা জ্বালাদায়ক প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন

এই ঘণীভবনকে একটু বাড়ানো যায় অর্থাৎ প্রতি ঘন মিটারে ১-৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত তখন প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে অসহনীয়, তার পর ঘণীভবনের পরিমাণ যখন প্রতি ঘন মিটারে ৪০-৭৫ মিলিগ্রামের উপরে যায় তখন এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে। বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সি-এস শক্তিকে একটা ধ্বংসাত্মক অস্ত্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং ১৯২৫ সালের জেনিভা চুক্তির অধীন নিষিদ্ধ শক্তির বিভাগে একে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আর ঠিক এই অবস্থাটাই (অর্থাৎ একটা সীমিত এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সি-এস শক্তির ব্যবহার) মার্কিন সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল ভিয়েতনামে। এই সি-এস শক্তির প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক নাগরিক তাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং দেশপ্রেমী শক্তিসমূহ উৎখাত হয়েছিল তাদের গুহা আর আশ্রয়স্থল থেকে। কোন কোন আশ্রয়স্থলে দ্রুত ব্যবহৃত এই সি-এস শক্তির পরিমাণ এত মারাত্মক ঘনত্বে পৌঁছেছিল যে ওইসব আশ্রয়স্থলগুলি 'গ্যাস-চেম্বারে' পরিণত হয়েছিল।

সি-এস শক্তি এবং ওগুলো ছড়াবার জন্য মাধ্যমের ফরমাসের প্রভূত বৃদ্ধির কথা বিচার করলে ধরে নিতে হয় ওই রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বরং সুবিধাজনক ছিল। আমেরিকানরা এবং সায়গন বাহিনী প্রথমে ব্যবহার করেছিল কেবলমাত্র সাধারণ রাসায়নিক গ্রেনেড, যা নগর-পুলিশের হাতে ছিল। পরবর্তীকালে পাঁচ ধরনের কামানের গোলা, বায়বীয় ক্যাসেট, পিপে, বিশেষ কৌশল, ক্যানিস্তার, প্লাস্টিক থলে এবং অন্যান্য মাধ্যমের উন্নতি ঘটেছিল এবং সেগুলোকে পরীক্ষাও করা হয়েছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভিন্ন ধরনের যেসব সি-এস স্প্রে ভিয়েতনামে পরীক্ষিত হয়েছিল সেগুলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাজে লাগল।

এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস এবং বি-এ-ইর মতো শক্তিগুলো ছিল অতি পরিচিত। এখানে তাদের কতকগুলো ধর্মের কথা উল্লেখ করা হোল।

ক্লোরাসেটোফেনান (সি-এন)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকারিতা হল প্রারম্ভিক ঘণীভবন—০˙০০৩ এম. জি./১ ; অসহনীয় ঘণীভবন—০.০০৪৫ এম. জি./১। যখন ঘণীভবনের পরিমাণ ০˙০৫ এম. জি./১ হয় এটা ফুসফুসগত শোথরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘণীভবনের পরিমাণ যখন ০.১ এম. জি./১ হয় এটা চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর ১০ মিনিটের আক্রমণ ঘটার কালে প্রাণঘাতী ঘণীভবনের পরিমাণ ০.৮৫ এম. জি./১।

অ্যাডামসাইট (ডি-এম)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকরী ঘণীভবন হল—০˙০০০৩৮ এম. জি./১ ; অসহনীয় ঘণীভবন হল—০˙০০৫ এম. জি./১,

আক্রমণের রণ-নীতি

তার আক্রমণমুখী পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো তার রাসায়নিক অস্ত্রাদি পরিত্যাগের কথা চিন্তা করেনি। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় রাসায়নিক অস্ত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত মার্কিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের মূল্যায়ন থেকে।

সাল ১৯১৯ঃ জেনারেল জন জে. পার্শিং বলেছিলেন, "ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহৃত হবে কি হবে না সেটা একটা অনুমানের বিষয় কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অসাবধানীদের কাছে এমন মারাত্মক হবে যে সেই প্রশ্নটাকে মোটেই আমরা অবহেলা করতে পারি না।"

সাল ১৯৬৪ঃ জেনারেল জে. এইচ. রথচাইল্ড, একজন মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র হল আগামী দিনের অস্ত্র এবং সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের রয়েছে বিশেষ গুণ এবং শত্রুপক্ষের ব্যক্তি-প্রাধান্য ধ্বংস করার ক্ষমতা।

সাল ১৯৮২ঃ অ্যামোরেটা এম. হোবার, সামরিক বাহিনীর গবেষণা ও উন্নতি বিভাগের উপ-সহ-সম্পাদক, ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত রাসায়নিক যুদ্ধকে যে কোন সংঘর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা।

"নিঃশব্দ মৃত্যু" ঘটানোর এই বর্বর অস্ত্র মার্কিন সামরিক গুদামে শুধু শুধু পড়ে থাকল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কোরীয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ায়। ওগুলো আবার আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া এবং অন্যান্য দেশের প্রতি-বিপ্লবীদের গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

ইন্দোচীনের দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের রাসায়নিক অস্ত্রের বৃহত্তম পরীক্ষাক্ষেত্ররূপে পরিণত করল। সেইসব স্থানে পেণ্টাগণ মানব জাতির বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবহার করেছিল এইসব রাসায়নিক অস্ত্রাদি—সি-এস, সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস, বি-এ-ই এবং বি-জেড।

মার্কিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দাবী অনুযায়ী ওইসব রাসায়নিক শক্তিগুলি সত্যিই কি প্রাণঘাতী নয়?

সি-এস শক্তির ক্ষমতা কতখানি দেখা যাক। প্রতি ঘন মিটারে এই শক্তির ০'০৫ – ০.১ মিলিগ্রামের ঘণীভবন একটা জ্বালাদায়ক প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন

এই ঘণীভবনকে একটু বাড়ানো যায় অর্থাৎ প্রতি ঘন মিটারে ১-৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত তখন প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে অসহনীয়, তার পর ঘণীভবনের পরিমাণ যখন প্রতি ঘন মিটারে ৪০-৭৫ মিলিগ্রামের উপরে যায় তখন এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে। বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সি-এস শক্তিকে একটা ধ্বংসাত্মক অস্ত্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং ১৯২৫ সালের জেনিভা চুক্তির অধীন নিষিদ্ধ শক্তির বিভাগে একে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আর ঠিক এই অবস্থাটাই (অর্থাৎ একটা সীমিত এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সি-এস শক্তির ব্যবহার) মার্কিন সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল ভিয়েতনামে। এই সি-এস শক্তির প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক নাগরিক তাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং দেশপ্রেমী শক্তিসমূহ উৎখাত হয়েছিল তাদের গুহা আর আশ্রয়স্থল থেকে। কোন কোন আশ্রয়স্থলে দ্রুত ব্যবহৃত এই সি-এস শক্তির পরিমাণ এত মারাত্মক ঘনত্বে পৌঁছেছিল যে ওইসব আশ্রয়স্থলগুলি 'গ্যাস-চেম্বারে' পরিণত হয়েছিল।

সি-এস শক্তি এবং ওগুলো ছড়াবার জন্য মাধ্যমের ফরমাসের প্রভূত বৃদ্ধির কথা বিচার করলে ধরে নিতে হয় ওই রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বরং সুবিধাজনক ছিল। আমেরিকানরা এবং সায়গন বাহিনী প্রথমে ব্যবহার করেছিল কেবলমাত্র সাধারণ রাসায়নিক গ্রেনেড, যা নগর-পুলিশের হাতে ছিল। পরবর্তীকালে পাঁচ ধরনের কামানের গোলা, বায়বীয় ক্যাসেট, পিপে, বিশেষ কৌশল, ক্যানিস্তার, প্লাস্টিক থলে এবং অন্যান্য মাধ্যমের উন্নতি ঘটেছিল এবং সেগুলোকে পরীক্ষাও করা হয়েছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভিন্ন ধরনের যেসব সি-এস স্প্রে ভিয়েতনামে পরীক্ষিত হয়েছিল সেগুলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাজে লাগল।

এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস এবং বি-এ-ইর মতো শক্তিগুলো ছিল অতি পরিচিত। এখানে তাদের কতকগুলো ধর্মের কথা উল্লেখ করা হোল।

ক্লোরাসেটোফেনান (সি-এন)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকারিতা হল প্রারম্ভিক ঘণীভবন—০·০০৩ এম. জি./১ ; অসহনীয় ঘণীভবন—০.০০৪৫ এম. জি./১। যখন ঘণীভবনের পরিমাণ ০·০৫ এম. জি./১ হয় এটা ফুসফুসগত শোথরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘণীভবনের পরিমাণ যখন ০.১ এম. জি./১ হয় এটা চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর ১০ মিনিটের আক্রমণ ঘটার কালে প্রাণঘাতী ঘণীভবনের পরিমাণ ০.৮৫ এম. জি./১।

অ্যাডামসাইট (ডি-এম)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকরী ঘণীভবন হল—০·০০০৩৮ এম. জি./১ ; অসহনীয় ঘণীভবন হল—০·০০৫ এম. জি./১,

আক্রমণের রণ-নীতি

তার আক্রমণমুখী পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনো তার রাসায়নিক অস্ত্রাদি পরিত্যাগের কথা চিন্তা করেনি। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় রাসায়নিক অস্ত্রের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত মার্কিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্তাদের মূল্যায়ন থেকে।

সাল ১৯১৯ঃ জেনারেল জন জে. পার্শিং বলেছিলেন, "ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহৃত হবে কি হবে না সেটা একটা অনুমানের বিষয় কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অসাবধানীদের কাছে এমন মারাত্মক হবে যে সেই প্রশ্নটাকে মোটেই আমরা অবহেলা করতে পারি না।"

সাল ১৯৬৪ঃ জেনারেল জে. এইচ. রথচাইল্ড, একজন মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, বলেছিলেন যে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র হল আগামী দিনের অস্ত্র এবং সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তাদের রয়েছে বিশেষ গুণ এবং শত্রুপক্ষের ব্যক্তি-প্রাধান্য ধ্বংস করার ক্ষমতা।

সাল ১৯৮২ঃ অ্যামোরেটা এম. হোবার, সামরিক বাহিনীর গবেষণা ও উন্নতি বিভাগের উপ-সহ-সম্পাদক, ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত রাসায়নিক যুদ্ধকে যে কোন সংঘর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গণ্য করা।

"নিঃশব্দ মৃত্যু" ঘটানোর এই বর্বর অস্ত্র মার্কিন সামরিক গুদামে শুধু শুধু পড়ে থাকল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করল কোরীয়া, ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ায়। ওগুলো আবার আফগানিস্থান, নিকারাগুয়া এবং অন্যান্য দেশের প্রতি-বিপ্লবীদের গোষ্ঠীর কাছে সরবরাহ করা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।

ইন্দোচীনের দেশগুলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের রাসায়নিক অস্ত্রের বৃহত্তম পরীক্ষাক্ষেত্ররূপে পরিণত করল। সেইসব স্থানে পেন্টাগণ মানব জাতির বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবহার করেছিল এইসব রাসায়নিক অস্ত্রাদি—সি-এস, সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস, বি-এ-ই এবং বি-জেড।

মার্কিনী সামরিক এবং রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দাবী অনুযায়ী ওইসব রাসায়নিক শক্তিগুলি সত্যিই কি প্রাণঘাতী নয়?

সি-এস শক্তির ক্ষমতা কতখানি দেখা যাক। প্রতি ঘন মিটারে এই শক্তির ০·০৫ – ০.১ মিলিগ্রামের ঘণীভবন একটা জ্বালাদায়ক প্রভাব সৃষ্টি করে। যখন

এই ঘণীভবনকে একটু বাড়ানো যায় অর্থাৎ প্রতি ঘন মিটারে ১-৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত তখন প্রতিক্রিয়া হয়ে ওঠে অসহনীয়, তার পর ঘণীভবনের পরিমাণ যখন প্রতি ঘন মিটারে ৪০-৭৫ মিলিগ্রামের উপরে যায় তখন এক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে। বিশেষজ্ঞদের নিরীক্ষণ অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সি-এস শক্তিকে একটা ধ্বংসাত্মক অস্ত্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে এবং ১৯২৫ সালের জেনিভা চুক্তির অধীন নিষিদ্ধ শক্তির বিভাগে একে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

আর ঠিক এই অবস্থাটাই (অর্থাৎ একটা সীমিত এলাকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সি-এস শক্তির ব্যবহার) মার্কিন সেনাবাহিনী সৃষ্টি করেছিল ভিয়েতনামে। এই সি-এস শক্তির প্রভাবে প্রচুর সংখ্যক নাগরিক তাদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং দেশপ্রেমী শক্তিসমূহ উৎখাত হয়েছিল তাদের গুহা আর আশ্রয়স্থল থেকে। কোন কোন আশ্রয়স্থলে দ্রুত ব্যবহৃত এই সি-এস শক্তির পরিমাণ এত মারাত্মক ঘনত্বে পৌঁছেছিল যে ওইসব আশ্রয়স্থলগুলি 'গ্যাস-চেম্বারে' পরিণত হয়েছিল।

সি-এস শক্তি এবং ওগুলো ছড়াবার জন্য মাধ্যমের ফরমাসের প্রভূত বৃদ্ধির কথা বিচার করলে ধরে নিতে হয় ওই রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বরং সুবিধাজনক ছিল। আমেরিকানরা এবং সায়গন বাহিনী প্রথমে ব্যবহার করেছিল কেবলমাত্র সাধারণ রাসায়নিক গ্রেনেড, যা নগর-পুলিশের হাতে ছিল। পরবর্তীকালে পাঁচ ধরনের কামানের গোলা, বায়বীয় ক্যাসেট, পিপে, বিশেষ কৌশল, ক্যানিস্তার, প্লাস্টিক থলে এবং অন্যান্য মাধ্যমের উন্নতি ঘটেছিল এবং সেগুলোকে পরীক্ষাও করা হয়েছিল। ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হবার পর বিভিন্ন ধরনের যেসব সি-এস স্প্রে ভিয়েতনামে পরীক্ষিত হয়েছিল সেগুলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাজে লাগল।

এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সি-এন, ডি-এম, সি-এন-এস এবং বি-এ-ইর মতো শক্তিগুলো ছিল অতি পরিচিত। এখানে তাদের কতকগুলো ধর্মের কথা উল্লেখ করা হোল।

ক্লোরাসেটোফেনান (সি-এন)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকারিতা হল প্রারম্ভিক ঘণীভবন—০·০০৩ এম. জি./১ ; অসহনীয় ঘণীভবন—০.০০৪৫ এম. জি./১। যখন ঘণীভবনের পরিমাণ ০·০৫ এম. জি./১ হয় এটা ফুসফুসগত শোথরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘণীভবনের পরিমাণ যখন ০.১ এম. জি./১ হয় এটা চামড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর ১০ মিনিটের আক্রমণ ঘটার কালে প্রাণঘাতী ঘণীভবনের পরিমাণ ০.৮৫ এম. জি./১।

অ্যাডামসাইট (ডি-এম)। যার লঘিষ্ঠতম কার্যকরী ঘণীভবন হল—০·০০০৩৮ এম. জি./১ ; অসহনীয় ঘণীভবন হল—০·০০৫ এম. জি./১,

রাসায়নিক অস্ত্রাদি জনসন দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ১৯৬৯ সালের ঘটনার পর যখন ওকিনাওয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে স্নায়বিক গ্যাস ছিদ্রপথে বেরিয়ে গিয়েছিল, এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ওগুলো জাপানেই আছে (অথবা ওগুলো ওখানে পরে গোপনে আনা হয়েছে)। যাই হোক, বেশীর ভাগ জাপানীই কিন্তু এ ধরনের সম্ভাবনার কথা বাতিল বলে উড়িয়ে দেয় না।

পেন্টাগণের অভিমত অনুযায়ী, রাসায়নিক অস্ত্রাদি মজুত করার "আদর্শ জায়গা" হতে পারে গ্রেট ব্রিটেন (পোর্টন ডাউন এবং অন্যান্য অঞ্চল) যেখানে আছে রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণের শক্তিশালী বাহক আমেরিকান ফাইটার-বম্বার এফ-বি-১১১। হতে পারে ভেরোনা ও ভিসেনজা (ইটালী) নগরের আমেরিকান ঘাঁটি। এই কারণেই মার্কিন সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটিশ এবং ইটালীয়ান সরকারকে তাদের দেশে রাসায়নিক অস্ত্রাদির সমাবেশ ঘটাবার জন্য তাদেরকে রাজী করাতে চেষ্টা করেছেন।

এর সঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের সংবাদ সংস্থা আরও খবর দিয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাসায়নিক অস্ত্রাদি সমাবেশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে স্পেনে, ইজিপ্টে, তুরস্কে, পাকিস্তানে, ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপে, দক্ষিণ কোরিয়ার এবং ফিলিপাইনসে। এই ধরনের পরিকল্পনা সম্পাদন করার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে কয়েকশ' নূতন ধরনের যুদ্ধোপকরণ পরীক্ষা করে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুমেরু এবং উষ্ণমণ্ডলের অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান।

সামরিক উদ্দেশ্যে রাসায়নিক গবেষণা সর্বদাই প্রসারিত হচ্ছে, কারণ মানবদেহকে ধ্বংস করার জন্য নূতন লক্ষ্যবস্তুর অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। প্রত্যেক বছর কুড়ি হাজার রাসায়নিক যৌগ সংশ্লেষিত হচ্ছে; এবং সেগুলো অত্যাধুনিক ভৌত-রাসায়নিক, জৈব-রাসায়নিক এবং বিষ-বিজ্ঞানগত পদ্ধতির সাহায্যে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। নূতন ধরনের এবং নক্সার যুদ্ধোপকরণ—সম্মুখ সমরের অস্ত্র থেকে দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক অংশ পর্যন্ত—ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিকের ফলপ্রসূ ব্যবহারের জন্য।

এর সামরিক রাসায়নিক-অস্ত্রাগারের যুদ্ধকালীন উপযোগিতা গুণগতভাবে বৃদ্ধি করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র শক্তির বৈজ্ঞানিক প্রাযুক্তিক এবং শিল্পসংক্রান্ত সামর্থ্যকে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে। গ্রেট ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডা, ডেনমার্ক, সুইডেন, জাপান, ইজরায়েল, নেদারল্যাণ্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ইজিপ্ট এবং অন্যান্য দেশসমূহ নূতন রাসায়নিক শক্তি এবং যুদ্ধোপকরণের উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৬৪ সাল থেকে "ন্যাটো"-র যৌথ সামরিক কুচকাওয়াজে—যার সাংকেতিক নাম 'ফ্যালেক্স',

'উইন্‌টেক্স' ও 'অটাম ফোর্জ'—ইউরোপে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রায়শই আলোচিত হয়েছে এবং তাদের কার্যকারিতাও নিরূপিত হয়েছে।

নূতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদি সম্প্রসারিত করার জন্য এবং তাদের যুদ্ধে ব্যবহারের উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র শক্তিরা তাদের সামরিক রাসায়নিক ক্ষেত্রকে গড়ে তোলা এবং অত্যাধুনিক করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাসায়নিক যুদ্ধের জন্য মার্কিন সামরিক বিভাগে প্রতিরক্ষার উপ-সহকারী-সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে ; সামরিক বাহিনীতে রাসায়নিক যুদ্ধের সৈন্যবাহিনীর প্রবর্তন করা হয়েছে এবং রাসায়নিক যুদ্ধের বৃহৎ স্থলবাহিনীকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে পশ্চিম জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য মার্কিন মিত্র শক্তিরা।

মার্কিন স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতার উন্নতি ঘটানো হয়েছে। রাসায়নিক যুদ্ধ বিভাগের সামরিক বিশেষজ্ঞ, গোলন্দাজবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীকে এইসব রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহারের কলা-কৌশল এবং তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসংখ্য কেন্দ্রে এবং ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত দেশসমূহে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। রাসায়নিক অস্ত্রাদির সাহায্যে সামরিক অভিযান চালাবার জন্য একই রূপের প্রজ্ঞাপন সংকেত স্থাপন করা হয়েছে ন্যাটোভুক্ত সামরিক বাহিনীগুলিতে এবং বিশেষ সুরক্ষা মাধ্যমগুলিকে উপযুক্ত মানে উন্নীত করা হয়েছে। সদাসর্বদা পরিধানের জন্য ন্যাটো সেনাবাহিনী নিরাপত্তামূলক পোষাক ব্যবহার করে, তাছাড়া অতি আধুনিক ধরনের গ্যাস-মুখোশ, প্রাথমিক নিরীক্ষার মাধ্যম, রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসা—যেগুলোর সব সময় উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা চলেছে—এই সবই রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতিকে নিশ্চিত করে।

এইগুলো এবং আরও অন্য অনেক পদ্ধতি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র-শক্তিরা তাদের সামরিক রাসায়নিক সম্ভাবনাকে গড়ে তুলবার জন্য গ্রহণ করেছে, এইটাই তুলে ধরে যে তারা এমনকি এখনও ইউরোপে ব্যাপক আকারে আক্রমণাত্মক রাসায়নিক যুদ্ধ সংঘঠিত করতে প্রস্তুত। তথাপি, ওসব সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা বিরাট প্রচার অভিযান চালাতে চাইছে যার লক্ষ্য হল এটা প্রমাণ করা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাসায়নিক অস্ত্রাদির ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির মজুত ভাণ্ডার রয়েছে সেগুলো একেবারে সেকেলে এবং অচল এবং যুদ্ধোপকরণগুলি থেকে অসংখ্য রাসায়নিক শক্তির ছিদ্র লক্ষ্য করা গেছে।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? হ্যাঁ, বিগত ১০ বছর ধরে মার্কিনী যুদ্ধোপকরণগুলি থেকে রাসায়নিক শক্তির ছিদ্রপথে বহির্গমণের শত শত ঘটনা নজরে পড়েছে। কিন্তু

সঠিকভাবে বলতে গেলে সেটা আশা করাটা অন্যায় হবে না, কেননা যান্ত্রিক ত্রুটিযুক্ত যুদ্ধোপকরণকে বাতিল করাটা অসম্ভব। এই ধরনের ত্রুটিযুক্ত যুদ্ধোপকরণগুলি হল সামগ্রিক মজুত যুদ্ধোপকরণের একটা ক্ষুদ্র অংশ এবং ওগুলো, অতএব, সমগ্র মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্রাগারের ক্ষমতা এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিকরণকে এতটুকুও কমাতে পারবে না। ওই ব্যাপারে বিরাট সোরগোল তোলার কারণে আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে ওইসব মজুত-ভাণ্ডারে একটা সরকারী পরীক্ষা চালিয়েছিল ; আর তাদের সিদ্ধান্ত ছিল দ্ব্যর্থহীন ঃ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মার্কিন সামরিক যুদ্ধ উপকরণসমূহের অস্ত্রাগার সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে ব্যবহারের উপযুক্ত।

তাহলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যাপারে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে—এই প্রচারাভিযানের পিছনে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে? আসল উদ্দেশ্য হল জনগণকে প্রতারিত করা এবং একটা প্রচারের আবরণ ছড়িয়ে রাখা যার আড়ালে তারা একটা কর্মসূচী চালু করতে পারে তৃতীয় প্রজন্মের রাসায়নিক অস্ত্রাদির উন্নতির জন্য যার বুনিয়াদ হল যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদি। এটা সর্বজনবিদিত অকাট্য প্রমাণ যে বর্তমানে একটা তিক্ত সামরিক সমমর্যাদা বজায় রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ারিশ চুক্তি সংগঠন এবং ন্যাটোর মধ্যে। রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যাপারে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্বে যেরূপ দেখানো হয়েছে, এই ধরনের অস্ত্রের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রাগার তার কব্জায় রয়েছে, যাতে করে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যাপারে কেউ বলতে পারবে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্বে কখনো বা বর্তমানেও কখনো পিছিয়ে ছিল বা আছে। এই যে পিছিয়ে থাকার দাবি এটা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নাকচ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, কংগ্রেস সদস্য ডেভিড বনিয়ার লোকসভায় এই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির প্রস্তুতির জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তা ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে গৃহীত অনুরূপ কাজের একটা জবাব মাত্র। তিনি বলেছিলেন যে এর সমর্থনে কোন প্রমাণ ছিল না। সেনেট আর্মড সার্ভিসেস কমিটির একজন সদস্য সেনেটর গ্যারী হার্টের অভিমত অনুযায়ী, এই দাবীর সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭০ সাল থেকে দ্রুতগতিতে তার রাসায়নিক অস্ত্রাদি নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বস্তুতঃ, যতবার ওয়াশিংটন নূতন ধরনের অস্ত্রাদি, নূতন পরিকল্পনা পদ্ধতির উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে, ততবারই সে একটা সোরগোল তুলেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন না কোন অস্ত্রাদির ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছে, যেটা আমাদের এখানে আছে সেটা এই রুটিন মাফিক চর্চার ঠিক অন্য একটা উদাহরণ।

মার্কিন প্রশাসনের যুক্তিগুলোও সমান কৃত্রিম। তারা বলছে যে প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন নূতন রাসায়নিক অস্ত্রাদির যা হল

প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকানোর উপায়। আর তা যদি তাকে না করতে দেওয়া হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহারের উত্তরে নিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করবে পরমাণু অস্ত্র। অবশ্য ওয়াশিংটন এটা ভালো করেই জানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা তার ইউরোপীয় মিত্রশক্তিগুলির প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে রাসায়নিক আক্রমণের কোন ভয় নেই। এটা একটা সর্বজনবিদিত ব্যাপার যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে এই রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং ধ্বংস করার জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মিত্রশক্তির সঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটা চুক্তির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যা ইউরোপকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির হাত থেকে মুক্ত করবে। ইতিমধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রশক্তিরা এই রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং তার সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনের ব্যাপারে যে চুক্তি তাকে বাধা দিচ্ছে ; এমন কি তারা আঞ্চলিক আপোষ মীমাংসার ক্ষেত্রেও সোভিয়েত প্রস্তাব পর্যালোচনা করতেও অস্বীকার করেছে। এইসব ব্যাপারকে উপেক্ষা করা যায় না। তর্কের খাতিরেও যদি ধরা হয় যে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং বাধাদানের মাধ্যম হিসাবে নিশ্চিতভাবে এই যুগ্ম অস্ত্রাদির উন্নতি ঘটানো হচ্ছে, তবুও বলবো, হ্যাঁ বারবার বলবো, যে ওগুলো তৈরী হচ্ছে আমেরিকান এবং ইউরোপীয় জনসাধারণকে বিপথে চালিত করার জন্য।

কুলের উপর একটা প্রতিকূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এ°টেল পোকা ধরনের পরজীবী কীটদের প্রজাতিরও ব্যাপৃতির পরিবর্তন হল ; বিশেষ করে আবির্ভূত হল সেইসব ধরনের এ°টেল পোকা যারা ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু বহন করে। মশাদের প্রজাতিরও পরিবর্তন হল। সমুদ্র থেকে বহুদূরের অঞ্চলে গরান বনের মতো উপকূলবর্তী বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মশারা আবির্ভূত হল নিরীহ প্রকৃতির আঞ্চলিক রোগ বহনকারী মশাদের বদলে। ভিয়েতনামে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে তারা বহন করে আনল ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু। বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহারের ফলে অত্যুষ্ণ বনাঞ্চলে যে বাস্তুসংস্থান-সংক্রান্ত ভারসাম্যের ভাঙন দেখা দেয় তা মহামারী রোগজীবাণু বহনকারী প্রাণীদের এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এই রাসায়নিক কেবলমাত্র গাছপালাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তাই নয়, মানুষকেও। উদাহরণস্বরূপ, পিকলোরাম রাসায়নিকভাবে ডি. ডি. টি.-র মতোই স্থায়ী ও বিষাক্ত, যেটা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। সেই সময় এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে ২, ৪,৫ 'টি'-র বিষ কোন কোন গৃহপালিত জন্তুর ভ্রূণের বিকৃতি ঘটাতে পারে। ক্যাকোডাইলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা সেঁকোবিষের যৌগ যেটা প্রচণ্ড বিষাক্ত। এই সব বিষাক্ত রাসায়নিকসমূহ ব্যাপকভাবে ঘনাকারে ব্যবহৃত হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন ও সুপারিশের ১২ গুণ বেশী। কেবল গাছপালাই নয়, মানুষের উপরও এই সব রাসায়নিক ছিটানো হয়েছিল।

ডাইঅক্সিন, যা মিশ্রিত ছিল "কমলা শক্তির" সঙ্গে—মার্কিনীরা যেটা বলেছিল "ভুলক্রমে"—এর একটা বিশেষ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ছিল। শতশত কিলোগ্রাম ডাইঅক্সিন ব্যবহৃত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে, যেখানে এই রাসায়নিকের ১ মিলিগ্রামেরও কম পরিমাণ মানবজাতির পক্ষে প্রাণনাশক।

ডাইঅক্সিন যেহেতু রাসায়নিকভাবে স্থায়ী পদার্থ তাই ডাইঅক্সিনকে আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ভিয়েতনামের সেইসব অঞ্চলে যেখানে যেখানে এই "কমলা শক্তিকে" ছড়ানো হয়েছিল ; তাদেরকে মাটির উপরিভাগের নমুনা এবং ২ মিটার পর্যন্ত গভীর নমুনার মধ্য থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই বিষ যদি খাবার ও জলের সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে তবে তা ক্যান্সারজনিত রোগের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যকৃৎ এবং রক্তের ক্যান্সার, নবজাত শিশুর অঙ্গবিকৃতি, গর্ভস্রাব এবং গর্ভবতী মহিলার উপর অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব ঘটায়। ভিয়েতনামী চিকিৎসকদের সংগৃহীত ডাক্তারী প্রমাণে এটা প্রতীয়মাণ যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমেরিকানরা এই "কমলা শক্তি" ব্যবহার বন্ধ করার বহু বছর পরেও এর প্রতিক্রিয়া পুনরায় লক্ষ্য করা গেছিল এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আবার ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়।

ভিয়েতনামে রাসায়নিক যুদ্ধ বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে, যেটা ১৯৭০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনামে বাস্তু-সংস্থান সংক্রান্ত টাইম বোমা স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই টাইমবোমা জীবনচক্রের উপর প্রভাব বিস্তার করবে গাছপালা, প্রাণী এবং জলের নিচের জগতের অস্তিত্বের গঠনকে ধ্বংস করে এবং যা কখনই পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হবে না ; এছাড়া সেখানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের উপর একটা চরম আঘাত হানবে, এমন আঘাত বা ক্ষতি যা বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও নিরুপণ করা সম্ভব হবে না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাসায়নিক পত্রবিনষ্টকারী পদার্থ পরীক্ষা করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিকল্পনা হল এইসব অস্ত্রাদির আরও উন্নতিকরণ। মার্কিন সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, পেণ্টাগণ ইউরোপে, কোরীয় উপদ্বীপে, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, ক্যারিবিয়ান অববাহিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং সামরিক সংঘর্ষের পটভূমিকায় পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে এই উদ্ভিদ বিনষ্টকারী পদার্থের ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এইসব পরিকল্পনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আরও বেশী কার্যকরী পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের উন্নতির কাজ অব্যাহত রয়েছে।

মোটের উপর ইন্দোচীনে ব্যাপকহারে "রাসায়নিক পরীক্ষা" মার্কন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্ম সম্পন্ন করার জন্য "নমনীয়" সামরিক রাসায়নিক অস্ত্রাগার তৈরী করতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে, প্রাণঘাতী রাসায়নিক এবং পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের উন্নতি ঘটানো হয়েছে মানবজাতি এবং কৃষিজ উপাদানকে ধ্বংস করার জন্য। পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থাপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে শত্রুসৈন্যের আড়ালকারী আবরণকে উন্মোচন করার জন্য এবং বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তাদের ধ্বংসের কার্যকারিতাকে বর্ধিত করার জন্য। শক্তিশালী রাসায়নিকের, যা সামরিক অক্ষমতার সৃষ্টি করে, উন্নতি ঘটানো হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য। এটা সত্যই এক সুচিন্তিত অমানবিক রণ-নীতি।

মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশীয় অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরের জনসন দ্বীপে এবং পশ্চিম ইউরোপের গুদাম ব্যবস্থায় ও অস্ত্রাগারে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার পেণ্টাগণ গড়ে তুলেছে। অতএব উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান রাসায়নিক অস্ত্রাদির পশ্চিম জার্মানীতে মজুতের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পশ্চিমী সংবাদপত্র সর্বদাই হানাউ, মান্‌হাইম এবং মাস্-ভাইলার-এর সৈন্যশিবিরের কথা ঘনঘন উল্লেখ করে। মার্কনী সামরিক বাহিনীর সরকারী মন্তব্য সত্ত্বেও যে জাপানে মজুত করে রাখা আমেরিকান

কুলের উপর একটা প্রতিকূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এ'টেল পোকা ধরনের পরজীবী কীটদের প্রজাতিরও ব্যাপৃতির পরিবর্তন হল ; বিশেষ করে আবির্ভূত হল সেইসব ধরনের এ'টেল পোকা যারা ভয়ঙ্কর রোগের জীবাণু বহন করে। মশাদের প্রজাতিরও পরিবর্তন হল। সমুদ্র থেকে বহুদূরের অঞ্চলে গরান বনের মতো উপকূলবর্তী বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মশারা আবির্ভূত হল নিরীহ প্রকৃতির আঞ্চলিক রোগ বহনকারী মশাদের বদলে। ভিয়েতনামে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে তারা বহন করে আনল ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু। বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহারের ফলে অত্যুষ্ণ বনাঞ্চলে যে বাস্তুসংস্থান-সংক্রান্ত ভারসাম্যের ভাঙন দেখা দেয় তা মহামারী রোগজীবাণু বহনকারী প্রাণীদের এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

এই রাসায়নিক কেবলমাত্র গাছপালাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তাই নয়, মানুষকেও। উদাহরণস্বরূপ, পিকলোরাম রাসায়নিকভাবে ডি. ডি. টি.-র মতোই স্থায়ী ও বিষাক্ত, যেটা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। সেই সময় এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে ২, ৪,৫ 'টি'-র বিষ কোন কোন গৃহপালিত জন্তুর ভ্রূণের বিকৃতি ঘটাতে পারে। ক্যাকোডাইলিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা সেঁকোবিষের যৌগ যেটা প্রচণ্ড বিষাক্ত। এই সব বিষাক্ত রাসায়নিকসমূহ ব্যাপকভাবে ঘনাকারে ব্যবহৃত হয়েছিল যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন ও সুপারিশের ১২ গুণ বেশী। কেবল গাছপালাই নয়, মানুষের উপরও এই সব রাসায়নিক ছিটানো হয়েছিল।

ডাইঅক্সিন, যা মিশ্রিত ছিল "কমলা শক্তির" সঙ্গে—মার্কিনীরা যেটা বলেছিল "ভুলক্রমে"—এর একটা বিশেষ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ছিল। শতশত কিলোগ্রাম ডাইঅক্সিন ব্যবহৃত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে, যেখানে এই রাসায়নিকের ১ মিলিগ্রামেরও কম পরিমাণ মানবজাতির পক্ষে প্রাণনাশক।

ডাইঅক্সিন যেহেতু রাসায়নিকভাবে স্থায়ী পদার্থ তাই ডাইঅক্সিনকে আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ভিয়েতনামের সেইসব অঞ্চলে যেখানে যেখানে এই "কমলা শক্তিকে" ছড়ানো হয়েছিল ; তাদেরকে মাটির উপরিভাগের নমুনা এবং ২ মিটার পর্যন্ত গভীর নমুনার মধ্য থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই বিষ যদি খাবার ও জলের সঙ্গে মানুষের দেহে প্রবেশ করে তবে তা ক্যান্সারজনিত রোগের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যকৃৎ এবং রক্তের ক্যান্সার, নবজাত শিশুর অঙ্গবিকৃতি, গর্ভস্রাব এবং গর্ভবতী মহিলার উপর অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব ঘটায়। ভিয়েতনামী চিকিৎসকদের সংগৃহীত ডাক্তারী প্রমাণে এটা প্রতীয়মাণ যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমেরিকানরা এই "কমলা শক্তি" ব্যবহার বন্ধ করার বহু বছর পরেও এর প্রতিক্রিয়া পুনরায় লক্ষ্য করা গেছিল এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রতিক্রিয়া আবার ঘটতে বলে আশঙ্কা করা হয়।

ভিয়েতনামে রাসায়নিক যুদ্ধ বিষয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে, যেটা ১৯৭০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভিয়েতনামে বাস্তু-সংস্থান সংক্রান্ত টাইম বোমা স্থাপনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই টাইমবোমা জীবনচক্রের উপর প্রভাব বিস্তার করবে গাছপালা, প্রাণী এবং জলের নিচের জগতের অস্তিত্বের গঠনকে ধ্বংস করে এবং যা কখনই পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হবে না ; এছাড়া সেখানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের উপর একটা চরম আঘাত হানবে, এমন আঘাত বা ক্ষতি যা বহু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও নিরুপণ করা সম্ভব হবে না।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাসায়নিক পত্রবিনষ্টকারী পদার্থ পরীক্ষা করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান পরিকল্পনা হল এইসব অস্ত্রাদির আরও উন্নতিকরণ। মার্কিন সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, পেন্টাগণ ইউরোপে, কোরীয় উপদ্বীপে, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, ক্যারিবিয়ান অববাহিকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং সামরিক সংঘর্ষের পটভূমিকায় পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে এই উদ্ভিদ বিনষ্টকারী পদার্থের ব্যবহারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। এইসব পরিকল্পনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য আরও বেশী কার্যকরী পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের উন্নতির কাজ অব্যাহত রয়েছে।

মোটের উপর ইন্দোচীনে ব্যাপকহারে "রাসায়নিক পরীক্ষা" মার্কন যুক্তরাষ্ট্রকে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্ম সম্পন্ন করার জন্য "নমনীয়" সামরিক রাসায়নিক অস্ত্রাগার তৈরী করতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে, প্রাণঘাতী রাসায়নিক এবং পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের উন্নতি ঘটানো হয়েছে মানবজাতি এবং কৃষিজ উপাদানকে ধ্বংস করার জন্য। পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থাপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে শত্রুসৈন্যের আড়ালকারী আবরণকে উন্মোচন করার জন্য এবং বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে তাদের ধ্বংসের কার্যকারিতাকে বর্ধিত করার জন্য। শক্তিশালী রাসায়নিকের, যা সামরিক অক্ষমতার সৃষ্টি করে, উন্নতি ঘটানো হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্য। এটা সত্যই এক সুচিন্তিত অমানবিক রণ-নীতি।

মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশীয় অংশে, প্রশান্ত মহাসাগরের জনসন দ্বীপে এবং পশ্চিম ইউরোপের গুদাম ব্যবস্থায় ও অস্ত্রাগারে রাসায়নিক অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার পেন্টাগণ গড়ে তুলেছে। অতএব উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকান রাসায়নিক অস্ত্রাদির পশ্চিম জার্মানীতে মজুতের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পশ্চিমী সংবাদপত্র সর্বদাই হানাউ, মানহাইম এবং মাস্-ভাইলার-এর সৈন্যশিবিরের কথা ঘনঘন উল্লেখ করে। মার্কনী সামরিক বাহিনীর সরকারী মন্তব্য সত্ত্বেও যে জাপানে মজুত করে রাখা আমেরিকান

যুগ্ম অস্ত্রাদির কর্ম-পরিকল্পনা : মানবজাতির পক্ষে নূতন বিপদ

মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্রাদির সক্ষমতা মার্কিন সামরিক বাহিনীর উত্তরোত্তর চাহিদার পক্ষে এখন আর যথেষ্ট নয়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অচল বলে ঘোষিত হয়েছে এইসব গ্যাস—স্নায়বিক গ্যাস (ভি-গ্যাসসমূহ), সারিন, সোমান, মনো-রাসায়নিক শক্তিসমূহ, যন্ত্রণাদায়ক এবং সমগোত্রীয় গ্যাসসমূহ। তার সামরিক কর্মসূচীতে, যার লক্ষ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আধিপত্য অর্জন করা, ওয়াশিংটন রাসায়নিক অস্ত্রের উপর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আরোপ করে এবং তার রাসায়নিক অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তাকে আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য সে একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রশক্তিগুলি ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে অতি বিষাক্ত শক্তিগুলিকে সনাক্ত করার ব্যাপারে একটা বিরাট প্রচেষ্টায় রত হয়েছে এইসব ক্ষেত্রে—জৈবিকভাবে সক্রিয় পদার্থের রসায়ন, কেন্দ্রীয় স্নায়বিক গঠনতন্ত্রের জৈব-রসায়ন, স্নায়ু-শারীর বিজ্ঞান, স্নায়ু-ঔষধ বিজ্ঞান, একটা বস্তুর গঠন ও তার ক্ষতিকারক প্রক্রিয়ার মধ্যে গাণিতিক রূপরেখা এবং সেই সঙ্গে সমগোত্রীয় রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। এর উদ্দেশ্য হল কোন প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত অজানা কোন কারিগরি এবং প্রচণ্ড উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিষ এবং সেই সঙ্গে নূতন যুগের রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণকে লাভ করা। সাধারণ রাসায়নিক রণসজ্জার পরিকল্পনার প্রধান জোরটা দেওয়া হয় যুগ্ম শক্তিসমূহের উন্নতি এবং প্রাকৃতিক বিষ ও বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে অতি বিষাক্ত শক্তি অন্বেষণের উপর।

যুগ্ম-রাসায়নিক অস্ত্রাদি হল সেই সব অস্ত্রাদি যা দুই বা ততোধিক প্রারম্ভিক উপাদানে পূর্ণ যার প্রতিটা অংশ বা ভাগ হল অ-বিষাক্ত বা অল্প-বিষাক্ত। যখন গোলা, ক্ষেপণাস্ত্র, বোম অথবা অন্য কোন অস্ত্র লক্ষ্যবস্তুর দিকে উড়ে যায় তখন প্রারম্ভিক উপাদানসমূহের মিশ্রণটা ভিতরেই সংঘটিত হয় ; এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটা অতি বিষাক্ত রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র গঠিত হয় যা সমস্ত জীবনকে ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে। অস্ত্রটি এই ক্ষেত্রে রাসায়নিক চুল্লী হিসাবে কার্য করে।

যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির ইতিহাস ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকের ঘটনা

যখন মার্কিন বিমান বাহিনী উন্নতি ঘটাতে শুরু করল একটা যুগ্ম আকাশী বোমা যা আঁসিন ছাড়তে পারে। কিন্তু ওই ধরনের বোমার উন্নতি ঘটানোর বিরাট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আসল লক্ষ্য কিন্তু পূরণ হল না।

পরবর্তীকালে এই যুগ্ম বোমা তৈরীর উপস্থাপনাটা তারা ব্যবহার করল বিষাক্ত শক্তি সমন্বিত অস্ত্রাদির উন্নতিকরণে যেগুলো দীর্ঘকাল মজুত ভাণ্ডারে থাকাকালীন তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। যে সমস্ত পদার্থ ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলো আহরিত হয়েছিল নাইট্রোসোকারবামেটস—যার সাংকেতিক নাম কে. ভি.-১০ এবং কে. ভি.-১৬। এটা অবশ্য প্রমাণিত হল যে কে. ভি.-১০ এবং কে. ভি.-১৬ প্রস্তুত করতে যে প্রাথমিক উপাদান লাগে সেগুলো নিজেরাই দীর্ঘস্থায়ী মজুতের পক্ষে দৃঢ় এবং সুপ্রযুক্ত নয়। তাই আরও দৃঢ় ও মজবুত উপাদানের ব্যবহার ঘটান হল যার বাস্তব ফল কিন্তু কিছুই হল না ; এবং অতএব যুগ্ম অস্ত্র তৈরীর কাজ অন্ততঃ কিছুকালের জন্য প্রসার লাভ করল না।

ঐ সময়কালের মধ্যে যুগ্ম অস্ত্রাদি সংক্রান্ত সমস্যাটা খুব একটা গুরুত্ব পেল না। আমেরিকানরা তখন দ্রুতগতিতে সামরিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছে নূতন ধরনের ডজন ডজন স্নায়বিক গ্যাস যেগুলো ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত গ্যাসের থেকেও শত শত গুণ বেশী ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক। ওইসব গ্যাস প্রস্তুতের জন্য তৈরী হতে লাগল শিল্প কারখানা এবং রাসায়নিক অস্ত্রাদির জন্য মজুত-ভাণ্ডার খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

যাই হোক, ১৯৬০-এর দশকের প্রথমদিকে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা কিন্তু আবার যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদি প্রসারের ভাবনায় প্রত্যাবর্তন করল। তার অবশ্য অনেক কারণও ছিল ; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অতি-বিষাক্ত পদার্থ—তৃতীয় প্রজন্মের রাসায়নিক যুদ্ধের শক্তিসমূহ—অনুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ঘাটতি। ১৯৬২ সালে পেণ্টাগণ একটা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করল যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির উন্নতির ব্যাপারে, যেটা অন্যান্য জাতীয় রণকৌশলগত কর্মসূচীর মতো একটা সর্বাগ্রাধিকার সম্পন্ন কর্ম-পরিকল্পনা ছিল এবং আছে। এটা রাসায়নিক উপাদান অনুসন্ধান করায় তীব্র কর্মকুশলতা দাবী করে যুগ্ম অস্ত্রাদি গঠনের জন্য, যেটা মজুতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্থায়ী হবে এবং প্রচণ্ড বিষাক্ত শক্তি দ্রুত উৎপাদন করার ব্যাপারে একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে সমর্থ হবে। আর এই পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হল সম্পূর্ণ ভিন্ন মিশ্রণসমূহ ঃ তরল-তরল, তরল-কঠিন, অনুঘটনকারী সংযোজক বস্তুর ব্যবহার, স্থিতিকারী শক্তিসমূহ এবং অন্যান্য উপাদানসমূহ।

যুগ্ম অস্ত্রাদির কর্মসূচীর প্রয়োগের প্রথম বছরে প্রধান জোরটা দেওয়া হয়েছিল ভি-এক্স এবং সারিন গ্যাসের দুটি উপাদানের প্রস্তুতির উন্নতির উপর। ১৯৬০

সালের শেষের দিকে দ্বি-উপাদান সমন্বিত সারিন এবং জি-বি-২-এর উন্নতি ঘটানো হয়েছিল। যে মৌল উপাদানে ঐ বিষাক্ত শক্তিটি তৈরী হয়েছিল সেগুলি হল ডাইফ্লুওরোনহাইড্রাইড (ডি-এফ) এবং আইসোপ্রোপিল অ্যালকোহল (জে-পি) একটা যুগ্ম বিক্রিয়ায় ভি-এক্স-২ গ্যাস প্রস্তুত করতে মৌল উপাদানের জন্য অনুসন্ধান অনেক বেশী শক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকানরা কিউ এল (এথিল-২-ডাইসোপ্রপাইলামাইনোথিল-মিথাইলফসফোনাইট) এবং এন-এম (ডাইমিথাইল-পলিসালফাইড) এর মধ্যে বিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে, কেননা এটাকে তারা খুব সম্ভাবনাময় এলাকা বলে মনে করছে।

ওই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থসমূহের উন্নতি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর ফলপ্রদ উৎপাদন লাভ করার উপর প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী উদ্বায়ুচারিতা সমন্বিত দ্বি-উপাদানের পদার্থকে সনাক্ত করার জন্য তীব্র অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল। বেশ কিছু যৌগ পদার্থ পরীক্ষা করা হয়েছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোমান (জি-ডি-২) যা মিথাইলফসফোনিলডাইক্লোরাইড এবং পিনাকোলাইন অ্যালকোহল থেকে সংশ্লেষিত। প্রচণ্ডভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে বায়োটক্সিন, সাইকোটোমাইমেটিক্স এবং সেইসব পদার্থের উপর যেগুলি ব্যবহৃত হবে জেনেটিক ও এথনিক রাসায়নিক অস্ত্রাদি নির্মাণে। দ্বি-উপাদানে নির্মিত অস্ত্রাদির উপর সামগ্রিক কাজকর্ম খুবই গোপনীয় বলে বিবেচিত হয় এবং যে কেউ কেবলমাত্র অনুমান করতে পারে কি দারুণ কার্যকরী এটি।

দ্বি-উপাদানে নির্মিত অস্ত্রাদির উন্নতির অন্য স্তর, যেটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, হল বোমা, মাইন, গোলা, ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরক অংশ এবং ডেলিভারী যানের নক্সা প্রস্তুতের কাজ।

একটা দ্বি-উপাদানে নির্মিত বিস্ফোরক অস্ত্র গঠিত হয় ফিউজসহ বিস্ফোরক অংশ দিয়ে—বিস্ফোরণের মুখটির মধ্যে থাকে বিস্ফোরক পদার্থ, অস্ত্রের গায়ে থাকে ছোট ছোট ঘর বা গর্ত যার মধ্যে বিষাক্ত শক্তির উপাদান থাকে ঠাসা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী উপাদানসমূহের মিশ্রণের জন্য উদ্ভাবিত হয় কৌশল।

একটা দ্বি-উপাদানে নির্মিত অস্ত্রের নক্সা করার প্রধান সমস্যা হল উপাদানসমূহের দ্রুত এবং সম্পূর্ণ মিশ্রণ নিশ্চিত করা, যদি সম্ভব হয় মিশ্রণ কৌশলের সাহায্য ছাড়াই, যার উপস্থিতি বাস্তবিকপক্ষে নক্সাকে জটিল করে তোলে এবং মৌল উপাদানের জন্য খুবই কম জায়গা রেখে দেয়। সাধারণভাবে সমস্ত গঠনতান্ত্রিক পদার্থ, যেমন জীব বা উদ্ভিদদেহের ঝিল্লী, পাত্রের বা জায়গার দেওয়াল এবং মিশ্রণের কৌশল রাসায়নিক শক্তির পে-লোডের বোমাটাকে কমিয়ে দেয়। এবং নক্সা-প্রস্তুতকারকরা সর্বদাই সমস্যার সহজতম এবং কার্যকরী সমাধানের জন্য

অনুসন্ধান চালাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কামানের গোলার ক্ষেত্রে মিশ্রণটা শূন্যে গোলার দ্রুত ঘূর্ণনের দ্বারা পাওয়া যায়। বোম এবং স্প্রে ট্যাংকের ক্ষেত্রে বিশেষ মিশ্রণকারিগরীর অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

দ্বি-উপাদানে নির্মিত সারিন (জি. বি.-২) দ্বারা পরিপূর্ণ ১৫৫-এম. এম. হাউইৎজার গোলা (এম. ৬৮৭) ছিল প্রথম দ্বি-উপাদানে নির্মিত অস্ত্র যাকে পরীক্ষার একটা পূর্ণ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল এবং যেটা বেশ কয়েক বৎসর ধরে চলেছিল। এটা ১৯৭৭ সালে কার্যকরী তালিকার অংশরূপে ছিল। বর্তমানে, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এর পুরো মাত্রার উৎপাদনের জন্য অর্থ বণ্টন করা হয়েছে। এম. ৬৮৭ রাসায়নিক গোলা প্রধান দাহ্য পদার্থপূর্ণ নল, বিস্ফোরক, একটা আইসোপ্রোপিল অ্যালকোহল এবং অ্যামাইন (জে. পি. এ.)-এর মিশ্রণের পাত্র এবং ডাইফ্লুয়োরোমিথাইলফসফেনেট-এর একটা পাত্র দ্বারা সজ্জিত। যখন অস্ত্রটা ছোঁড়া হয় তখন প্রতিক্ষেপের চাপে পাত্রগুলো ভেঙে যায় এবং যখন গোলাটা লক্ষ্যবস্তুর দিকে উড়ে যায়, রাসায়নিক উপাদানগুলো মিশে যায় এবং একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যার ফলে তৈরী হয় সারিন। এম. ৬৮৭ গোলাটিই ছিল প্রথম মার্কিনী অস্ত্র যার মধ্যে সারিন তৈরী করার জন্য একটা দ্বি-উপাদানের বিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছিল। মার্কিনী বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করে যে দ্বি-উপাদানে গঠিত নয় এমন রাসায়নিক অস্ত্রাদির সঙ্গে তুলনায় এই গোলার মজুত, আনা-নেওয়া এবং ব্যবহারের ব্যাপারে অনেক বেশী সুবিধা আছে।

তারপর ভি. এক্স-২ দ্বারা পরিপূর্ণ এক্স. এম. ৭৩৬ ২০৩·২-এম. এম. হাউইৎজার দ্বি-উপাদানে গঠিত গোলার উন্নতি ঘটানো হল যার পরিকল্পনা এবং কাজের নীতি এম. ৬৮৭ গোলার কর্মনীতির মত একই। যখন গোলা লক্ষ্যবস্তুর দিকে উড়ে যায় তখন দুটো কম বিষাক্ত মধ্যবর্তী উৎপাদন, যাদের সাংকেতিক নাম কিউ. এল এবং এন. এম., একে অপরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং ভি. এক্স. দ্বি-উপাদানজাত বিষাক্ত শক্তি তৈরী করে।

১৩,৪৩৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে ৫০০ পাউণ্ডের বাইগেই বোমা সম্প্রসারিত করার কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৮-এর অর্থনৈতিক বৎসরে এর আদি রূপটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল এবং এর উৎপাদনের জন্য অর্থও বিশেষভাবে কাজে লাগান হয়েছিল।

১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা দ্বি-উপাদানজাত গোষ্ঠীর বোমা সুকৌশলে উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর ক্যাসেটটার একটা বায়ুরোধকারী সিল করা আকার ছিল যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রচুর সংখ্যক বন্দুকের ছোট গুলি। যৌগিকের প্রথম উপাদানটি বন্দুকের ছোট ছোট গুলি ভিতরে রাখা হয়, আর দ্বিতীয় উপাদানটি তাদের মধ্যেকার শূন্য স্থানকে ভর্তি করে। উভয় উপাদানই তরল। ক্যাসেটকে

লক্ষ্যবস্তুর উপর ফেলার আগে দ্বিতীয় উপাদানকে চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বন্দুকের ছোট ছোট গুলির মধ্যে যেগুলো ব্লেড দ্বারা সজ্জিত। উড়ন্ত অবস্থায় বন্দুকের গুলিসমূহের ঘূর্ণন এবং ক্যাসেটটা খুলে যাওয়ার পরে উপাদানগুলোর মিশ্রণকে নিশ্চিত করে ব্লেডগুলো। যেহেতু বন্দুকের ছোট গুলিগুলো বেশ অনেকটা দূরবর্তী স্থানের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে সক্ষম, তারা কিন্তু লক্ষ্য স্থানের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটা গুলির একটা বিস্ফোরক কৌশল আছে যেটা মাটিতে পোঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চশব্দে বিস্ফোরিত হয়।

রাসায়নিক যুদ্ধায়োজনের কর্মসূচীও দ্বি-উপাদানজাত বিষাক্ত শক্তির স্প্রে কৌশলের জন্য উন্নতি দাবী করে।

মহাশূন্যে ব্যবহৃত অন্যান্য অস্ত্রাদির উন্নতির জন্য কাজকর্ম চলছে, সেই সঙ্গে বিভিন্ন গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য যুদ্ধোপকরণ এবং শত্রুসন্ধানকারী ও নিধনকারী ক্ষেপণাস্ত্র ও তার মর্টার নিক্ষেপের পদ্ধতি ও বিস্ফোরক অংশের কাজকর্মও চলছে।

ব্যাপক আকারের যে দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদির কর্মসূচী, যেটা বর্তমান স্তরে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ভূমিকা ও তাৎপর্যের একটা সার্বিক সুকৌশলী পূর্ণ মূল্য-নির্ণায়নের অংশমাত্র, সেটা বর্তমান মার্কিন প্রশাসন চালু করেছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে দ্বি-উপাদান জাত ধারণার ভিত্তির উপর রাসায়নিক অস্ত্রাদির জন্য অস্ত্রাগার গঠন ও তার আধুনিকীকরণ হল একটা সর্বাগ্রগণ্য জাতীয় কর্মসূচী। কিছুকাল পরে (১৯৮৩-সালের জুলাই মাস) অ্যামোরেটো হোবার, যাঁর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বললেন যে প্রশাসন দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদির উন্নতির ও সম্প্রসারণ আবশ্যিক প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেছেন এবং নিকট ভবিষ্যতেও এই প্রশ্নেই তাঁরা আবার নিশ্চিতভাবে ফিরে আসবেন।

১৯৮৫ সালের গ্রীষ্মে মার্কিন কংগ্রেস প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে প্রায় তিন বছরের জন্য এই দ্বি-উপাদান জাত অস্ত্রাদি নির্মাণের জন্য টাকাপয়সা আলাদা করে রেখে ছিল। এই চাপ আরও বেড়ে গেল ১৯৮৫ সালের মধ্যেই যখন পেণ্টাগণ ঘোষণা করল দ্বি-উপাদান সংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণটা একটা সর্বাধিক অগ্রগণ্য কাজ বলে। ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই কাসপার ওয়েইনবার্গার এবং অন্যান্য উচ্চ সামরিক পদাধিকারীরা এই নূতন রাসায়নিক অস্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য বিশেষ বাজেট উপযোজনার উপর জোর দিতে লাগলেন। মার্চ মাসে সরকারীভাবে উচ্চপর্যায়ের যে রাসায়নিক যুদ্ধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়েছিল—যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এইসব অত্যুৎসাহী সমর্থক, যেমন জিগনিউ, জেজিনস্কি, আলেকজাণ্ডার হেগ এবং অন্যান্যরা—সেটা স্থির করল যে নূতন রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যাপকহারে

উৎপাদন ঘটিয়ে মার্কিন রাসায়নিক অস্ত্রাগারের আধুনিকীকরণ খুবই জরুরী। যদিও কমিশন খুব একটা বাস্তববাদী ছিল না কেননা তাতে দ্বি-উপাদান সংক্রান্ত কর্মসূচীর কোন সমালোচক অন্তর্ভুক্ত হন নি, তবুও এর রিপোর্ট, যেটা নতুন রাসায়নিক অস্ত্রাদি নির্মাণে উৎসাহ যুগিয়েছিল, ওয়াশিংটনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং এর সুপারিশসমূহও গ্রহণ করা হয়েছিল।

মার্কিন প্রশাসন দ্বারা গৃহীত রাসায়নিক যুদ্ধ প্রস্তুতির কর্মসূচীর জন্য আগামী বছরগুলিতে মোটামুটিভাবে খরচ হবে দশ বিলিয়ন ডলার। এর অন্তর্ভুক্ত হল :

(ক) —দ্বি-উপাদানজাত বিষাক্ত শক্তির উৎপাদান ও তাদের ডেলিভারী দেবার অস্ত্রাদির জন্য একটা শক্তিশালী প্রাযুক্তিক সুবিন্যস্ত ও সুসংহত স্থায়ী পরিকাঠামো স্থাপন।

(খ) —গবেষণার এবং উন্নতির প্রচেষ্টার তীব্রতা ও বিস্তৃতি, যার লক্ষ্য হল রাসায়নিক যুদ্ধ উপকরণ এবং তাদের ডেলিভারী পদ্ধতির কার্যকারিতার বৃদ্ধি ঘটান।

(গ) —রাসায়নিক অস্ত্রাদির যুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নির্দেশ ও হাতে-কলমে অস্ত্রাদি ব্যবহার-শিক্ষার প্রস্তুতি এবং বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার ও তজ্জনিত সুরক্ষার ব্যাপারে সামরিক কর্মীদের শিখণের জন্য পদ্ধতি ও প্রকরণের উন্নতি।

(ঘ) —সামরিক বাহিনীকে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য কার্যকর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ, রাসায়নিক পরিদর্শন-পরিক্রমা এবং পূর্ব সতর্কীকরণ, রোগ সংক্রামণ হতে মুক্তি ও চিকিৎসা।

(ঙ) —রাসায়নিক অস্ত্রাদির যুদ্ধে ব্যবহারের পরিকল্পনার দায়িত্ব থাকা রাজনৈতিক ও সামরিক দলের পুনর্গঠন ও দৃঢ়করণ এবং যুদ্ধ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর এবং ছকের উন্নতিকরণ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে রাসায়নিক যুদ্ধের প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তরে একজন সহকারী সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একদল বিশেষ সেনানী তাঁর নামে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পেণ্টাগনে রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপরেও একটা সমন্বয়কারী কমিটি আছে, যার সদস্যারা হল প্রতিরক্ষা দপ্তরের সম্পাদকের বিশেষ সেনানীবৃন্দ, সমস্ত সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ, সেনানীদের যুগ্ম প্রধানেরা এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ।

পাইন ব্লাফে সামরিক রাসায়নিক অস্ত্রাগারে যে কারখানাটি আছে সেটি এখন দ্বি-উপাদানে নির্মিত অস্ত্রাদি উৎপাদন শুরু করতে প্রস্তুত—সেগুলি হল কামানের গোলা এবং আকাশী বোমা। পরবর্তীকালে ওগুলো আবার অন্য কারখানাতেও তৈরী হবে। বর্তমান পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হল পাঁচ মিলিয়ন রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন।

এই দ্বি-উপাদানে নির্মিত অস্ত্রাদি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও পরীক্ষা করেছেন বিভিন্ন দেশের সামরিক বিশ্লেষণকারীরা, শিল্প বিশেষজ্ঞরা, বৈজ্ঞানিকেরা সাংবাদিকেরা এবং রাজনীতিবিদরা এবং তাঁদের সর্বজনস্বীকৃত সিদ্ধান্ত হল ঃ এই যে দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদি সহ রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণের পরিকল্পনা, তার উদ্দেশ্য হল আক্রমণাত্মক সুকৌশলী সামরিক এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের পশ্চাদ্ধাবন করা। এটা বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যের যে স্থিতি আছে সেটাকে টলিয়ে দেবার ওয়াশিংটনের একটা সার্বিক প্রচেষ্টার অংশমাত্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর সামরিক এবং প্রাযুক্তিক আধিপত্য সুরক্ষিত ও নিশ্চিত করা। এছাড়া, এটা নূতন একটা এলাকায় এবং গুণগতভাবে উচ্চ স্তরে সামরিক দৌড়কে তীব্রতর করে।

মূলগতভাবে নতুন পর্যায়ের রাসায়নিক অস্ত্র দ্বারা মার্কিন সামরিক বাহিনীর রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণ বাস্তবিকপক্ষে রাসায়নিক যুদ্ধ হাতিয়ারের বর্তমান মার্কিন অস্ত্রাগারকে দ্বিগুণ করবে। পেণ্টাগণ বিশ্বাস করে যে তাহলে রাসায়নিক যুদ্ধে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ওটা বাস্তবিকপক্ষে মার্কিনী সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে কেবলমাত্র ইউরোপেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা হচ্ছে দ্বি-উপাদানজাত রাসায়নিক অস্ত্রাদির স্থাপন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের ইউরোপীয় সীমান্তের কাছে এবং বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী, গ্রেট ব্রিটেন, ইটালী ও তুরস্কে। প্রতিরক্ষার উপ-সহকারী সম্পাদক, টমাস ওয়েলচ-এর মন্তব্য অনুযায়ী এর লক্ষ্য হল খুব কম সময়ের ব্যবধানে ওয়ারশ চুক্তি সম্পাদনকারী সদস্য দেশগুলির প্রতিরক্ষার গভীর ভিতরে লক্ষ্যবস্তুর উপর রাসায়নিক অস্ত্রাদির প্রয়োগ ঘটানো, এর অর্থ হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানে এই রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হবে। এইভাবে তারা আমেরিকান অস্ত্রাগারের মধ্যে একটা রণকৌশলগত রূপ লাভ করেছে। দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদির বিমানবাহী জাহাজের, যুদ্ধজাহাজের এবং সাবমেরিনের মধ্যে সন্নিবেশ এবং বিস্তৃতকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার মিত্রদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ছাড়াই পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে রাসায়নিক যুদ্ধ সংঘটিত করতে সক্ষম করবে।

পেণ্টাগণ বিশ্বাস করে যে দ্বি-উপাদানজাত রাসায়নিক অস্ত্রাদির একটা উল্লেখ-যোগ্য সুবিধা হল এই যে ওগুলো কেবলমাত্র সম্মুখ-সারির সামরিক গুদাম বা ভাণ্ডারেই স্থাপন করা যাবে তাই নয়, সমস্ত ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ও কামানের রণ-অবস্থানে, বিমানবন্দরে ও নৌ-জাহাজেও স্থাপন করা যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা করছে তার মিত্রদের সক্ষমতাকে কি করে আরও কাজে লাগান যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রসারিত হওয়া

দ্বি-উপাদানজাত রাসায়নিক যুদ্ধোপকরণগুলি সমস্ত ন্যাটোভুক্ত দেশগুলির সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে।

এটা রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যাপক ব্যবহার কালে আকস্মিক উপাদানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে, যেটা ওই সমস্ত অস্ত্রাদির সবচেয়ে বেশী কার্যকারিতা লাভ করার জন্য খুবই জরুরী এবং আক্রমণাত্মক অভিযানে এবং প্রথম আঘাত হানার ক্ষেত্রে তাদের তাৎপর্যকে বাড়িয়ে তোলে। মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অ-পারমাণবিক লড়াইয়ে দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদিই হবে প্রচুর সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার মুখ্য মাধ্যম। দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদি এইভাবে মার্কিন অস্ত্র ভাণ্ডারে একটা পরিকল্পিত গুরুত্ব লাভ করে।

দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদির ব্যবহারে আকস্মিক উপাদানের বর্ধিত ভূমিকার অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, অস্ত্রের মধ্যে ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জি. বি.-২ ব্যবস্থায় যদি পাইনাকোলাইন অ্যালকোহলের পরিবর্তে আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয় তবে যেটা উৎপন্ন হবে সেটা সারিন নয়, সোমান। ফলস্বরূপ, প্রতিপক্ষ তার প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে এই ঘটনা প্রতিষ্ঠা করতে যে বিষাক্ত শক্তির ব্যবহার ঘটানো হয়েছে। বাধাপ্রাপ্ত হবে কি ধরনের শক্তির ব্যবহার হয়েছে তা সনাক্ত করতে এবং ডাক্তারি সাহায্যে, চিকিৎসা ও রোগমুক্তির কাজ সংগঠিত করতে। কোন কোন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ রক্ষাব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়তে পারে এবং আক্রমণকারী প্রচুরসংখ্যক মানুষকে ফ্রন্টলাইনের সামনে ও পিছনে কর্মহীন করে রাখতে সক্ষম হয়।

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদি উৎপাদনের প্রাযুক্তিক দিক। যেখানে সারিন, সোমান, ভি-এক্স এবং ওই একই ধরনের রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপকভাবে আধুনিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন একটা অতি-উন্নত ধরনের রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান এবং উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা-মূলক সাবধানতা, সেখানে দ্বি-উপাদানজাত যৌগিক বস্তুর জন্য তুলনামূলকভাবে কম বিষাক্ত উপাদানের উৎপাদন সম্ভব এমন কি একটা সাধারণ রাসায়নিক কারখানাতেও সরকারী বা বেসরকারী—এবং দ্বি-উপাদানজাত পদার্থের আদি-উপাদানগুলি বিশ্বের বাজারে বেশ সহজপ্রাপ্য। যে সমস্ত বস্তু থেকে এইসব আদি উপাদান সহজেই পাওয়া যায়, সেই সমস্ত বস্তুও সহজপ্রাপ্য। এছাড়াও, বিষাক্ত পদার্থসমূহের উৎপাদনের জন্য কোন অত্যাধুনিক দ্বি-উপাদানজাত যন্ত্রেরও প্রয়োজন নেই। ওই দ্বি-উপাদান জনিত বিক্রিয়া যে কোন আধারেই সংঘটিত হতে পারে, আর এইভাবে সংগৃহীত মিশ্রণটি পরবর্তীকালে কোন সাধারণ রাসায়নিক অস্ত্রের মধ্যে ভর্তি করা যেতে পারে। এই দ্বি-উপাদানজাত প্রযুক্তি এইভাবে শিল্পোন্নত

দেশগুলিতে রাসায়নিক অস্ত্রের গোপন উন্নয়ন করণের জন্যই কেবল ব্যবহৃত হবে তাই নয়, এটা শিল্পে অনুন্নত ছোট ছোট দেশগুলিকেও তাদের নিজস্ব রাসায়নিক অস্ত্রাগারের উন্নীতকরণে সক্ষম করে। আর তার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে রাসায়নিক অস্ত্রাদির অবাধ প্রসার লাভ ঘটতে থাকে। তখন যে-কোনোও দেশ এই অস্ত্র বেমক্কা ব্যবহার করে বসতে পারে, বিশেষ করে আঞ্চলিক সংঘর্ষে। যার ফলে এটা মানবজাতির উপর একটা বিশেষ এবং অপরিণামদর্শী বিপদের সৃষ্টি করে।

পরিশেষে, দ্বি-উপাদানজাত বা যুগ্ম অস্ত্রাদির কর্মসূচী এমন একটা রাস্তা তৈরী করে যাতে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য ভবিষ্যতের কোনো সম্মেলনের ব্যবস্থাদি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। কেননা, কি রাষ্ট্রায়ত্ব কি ব্যক্তিগত মালিকানার, উভয় প্রকার রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রেই যাচাইকরণের একটা সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কার্যত অসম্ভব। কিন্তু যদি এ ধরনের একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করাও যায়, এটাও অবরুদ্ধ হবে পেট্রোকেমিক্যাল, মেটালার্জিক্যাল কারখানায় অথবা অন্য কোন শিল্পে বিষাক্ত শক্তির আদি উপাদানসমূহের উৎপাদনকে সুপরিচালিত করার মাধ্যমে, যেটা প্রযুক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

এটা উল্লেখযোগ্য যে যুগ্ম অস্ত্রাদির উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন জেনিভা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা এবং এর মজুত-ভাণ্ডারের উচ্ছেদকরণের (যা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে) উপর একটা ভবিষ্যৎ সম্মেলনের ব্যবস্থা খসড়া করতে শুরু করেছিল। এটা ছিল একটা ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ যার উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনার মধ্যে সমস্যার প্রবর্তন ঘটানো যার সমাধান হবার আশা ধারণাসাধ্য ভবিষ্যতে নেই। মার্কিনী দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রাদির কর্মসূচী এই ক্ষেত্রে বস্তুতঃ যে কোন চুক্তির নিকট ছিল একটা অলঙ্ঘ্যণীয় বাধাস্বরূপ—এমন একটা বাধা যা সারা পৃথিবীর স্বার্থকে খোলাখুলিভাবে এবং নিন্দনীয়ভাবে অস্বীকার করে সৃষ্ট হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদি ইউরোপের কাছে একটা বিশেষ বিপদরূপে আবির্ভূত হয়েছে।

ন্যাটোর শরৎকালীন ফোর্জ—৮৫-র মহড়া শুরু হওয়ার আগে ব্রাসেল্‌স্-এ অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ইউরোপের মিত্রশক্তির প্রধান কম্যাণ্ডার জেনারেল বার্নাড ডবলিউ রজার্স বললেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাটোভুক্ত মিত্রশক্তিদের উচিত সমঝোতার পরিচয় দেওয়া এবং ইউরোপীয় অঞ্চলে নূতন যুগের রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্প্রসারণে বাধা না দেওয়া। রজার্স ঘোষণা করলেন যে সংকটময় মুহূর্তে ইউরোপের দরকার হবে যুগ্ম অস্ত্রাদির এবং সেই সময় ইউরোপীয় ভূখণ্ডে সেগুলো না পাওয়া গেলে কেবল একটা নিরাপত্তার অলীক অস্তিত্ব বিরাজ করবে। পেণ্টা-

গণের কর্মসূচীর রূপকারেরা এটা লক্ষ্য করল যে নিউট্রন এবং রাসায়নিক অস্ত্রাদি ও সেইসঙ্গে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রে পরিপূর্ণ ইউরোপের উচিত এমন একটা অঞ্চলে পরিণত হওয়া যেটা সমস্ত ধরনের আক্রমণাত্মক অস্ত্রাদি দ্বারা আপাদমস্তক সজ্জিত থাকবে এবং পরিণতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিশোধমূলক আঘাতের প্রধান লক্ষ্যস্থল হিসাবে বিবেচিত হবে। ওয়াশিংটন চাইবে যুদ্ধ এলাকার বাইরে বসে থাকতে ; আর বিপদের সময় কেবলমাত্র তার পশ্চিম ইউরোপীয় মিত্রদের লেলিয়ে দিতে।

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পশ্চিম ইউরোপে যদি যুগ্ম অস্ত্রাদি সন্নিবেশিত হয় তাহলে ইউরোপীয় মহাদেশে ভবিষ্যতের যুদ্ধে অনিবার্যভাবেই রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার হবে এবং ইউরোপীয় নয় বরং মার্কিন জেনারেলদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হবে কি না। অসামরিক জনগণের মধ্যে—এবারে যারা ইউরোপীয়—হতাহতের সংখ্যা হবে বিশাল, কেননা পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ-দের হিসাবে অসামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তার মাত্রা ২০-৩০ গুণনীয়ক কম সৈন্য-বাহিনীর ওই একই গুণনীয়কের চেয়ে। ১৯৬৮ সালের ইউটা ঘটনার ভিত্তিতে যাতে ৬,৫০০ টি ভেড়া মারা গিয়েছিল ভি-এক্স দ্বারা, পেন্টাগণ বিশেষজ্ঞরা হিসাব করেছে, উদাহরণ হিসেবে, যে ইউরোপের কোন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ওই একই ধরনের পরীক্ষা, যাতে কেবলমাত্র কয়েকশ কিলোগ্রাম বিষাক্ত শক্তির ব্যবহার আছে, প্রায় ১৩০,০০০ অ-সামরিক ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করবে—প্রাথমিকভাবে শিশু, স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধদের। যদি পশ্চিম জার্মানীর ভূখণ্ডে ইতিপূর্বে সঞ্চিত সমস্ত রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রকে ব্যবহার করা যায়—সেখানে মার্কিন সামরিক বাহিনী সঞ্চিত করে রেখেছে চার মিলিয়ন লিটার অতি বিষাক্ত সারিন এবং ভি. এক্স. গ্যাস—তাহলে অনুকূল অবস্থায় বিষাক্ত শক্তির মেঘ শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে পারবে, যার আওতায় আসবে বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশের ভূখণ্ড এবং শেষ করে দেবে একশ মিলিয়ন মানুষকে অথবা পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং নেদারল্যাণ্ডস্‌কে একত্রিত করে তাদের সমগ্র জনসংখ্যাকে। এইভাবে পেন্টাগণের পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাসায়নিক অস্ত্রাদি হবে অনেক বেশী কার্যকরী ও ফলপ্রদ সুকৌশলে পরিকল্পিত পারমাণবিক অস্ত্রাদির চেয়েও ; এবং নিউট্রন অস্ত্রাদির সঙ্গে একত্রে ব্যবহার এটা নিশ্চিত করবে যে মানুষ যেখানে ধ্বংস হয়ে যাবে, সম্পত্তি কিন্তু সেখানে থাকবে অটুট।

অতএব, এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে মার্কিনী রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রাগারের বিস্তৃতিতে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে বিষাক্ত পদার্থের মজুত-ভাণ্ডারের জন্য স্থান নির্বাচনে সামরিক শক্তিসমূহের এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের সরকারী ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণ তাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং

সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় মহাদেশের নিরাপত্তাজনিত স্বার্থের পরিপন্থী।

ভারতীয় শহর ভূপালের ট্রাজেডি বা বেদনাদায়ক ঘটনা রাসায়নিক যুদ্ধের প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে সমস্ত ইউরোপীয় দেশসমূহকে সতর্ক করতে পারে। বাস্তবিকই, মিথাইল আইসোসায়ানেট-এর বিষক্রিয়তা, যেটা শেষ করে দিয়েছিল ভূপালের হাজার হাজার জীবনকে এবং আহত করেছিল হাজার হাজারের দশ গুণ মানুষকে, হল সারিনের বিষক্রিয়তার একশ ভাগের এক ভাগ ; আর. ভি. এক্স সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ভূপালের ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে যদি রাসায়নিক অস্ত্রাদি ইউরোপে ব্যবহার করা হয় তাহলে অসামরিক জনসংখ্যার মধ্যেই হতাহতের সংখ্যা পৌঁছাবে দশ কোটিতে।

আমেরিকান রণনীতি পরিকল্পনাকারীরা রাসায়নিক যুদ্ধে পশ্চিম জার্মানীকে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে ঐতিহাসিকভাবে জার্মান সামরিক বাহিনী সব সময়েই রাসায়নিক অস্ত্রাদির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জার্মানরাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যাপকহারে রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের প্রবর্তন ঘটিয়েছিল এবং সেই সময়ের অগ্রসর অস্ত্র-ব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রাসায়নিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব বজায় রেখেছিল। জার্মানরা উন্নতি ঘটিয়েছিল ইপ্রাইট এবং একটা নতুন ধরনের অতিরিক্ত শক্তিশালী অর্গানোফসফরাস বিষ-এর যা আরোপ করতে পারে অ্যান্টিকোলাইন্‌স্টেরাজ-এর প্রভাব—যেমন ট্যাবুন, সারিন এবং সোমান।

হিটলার চেয়েছিল যে তার সামরিক বাহিনীর অধিকারে থাকবে এক কোটি গুলিগোলা বোঝাই করা রাসায়নিক অস্ত্রাদি। পশ্চিম জার্মানীর সরকার হিসেব করেছিল যে যুদ্ধের শেষে নাৎসী অস্ত্রাগারে প্রায় ততটা পরিমাণ বিষাক্ত শক্তি আছে যতটা পরিমাণ বর্তমানে মার্কিনী মজুত-ভাণ্ডারে আছে। তাহলে বাকী বিষাক্ত শক্তির কি হল? নাৎসী জার্মানী থেকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির মজুত-ভাণ্ডার সরানোর জন্য যুদ্ধের শেষে হিটলারের আদেশে জার্মান সৈন্যবাহিনী যে "ব্জুন্‌ফ্‌ট" গোপন অভিযান চালিয়েছিল তার ফল কি হল? এই সমস্ত প্রশ্নে বন্ কিন্তু আশ্চর্যজনক ও অস্বাভাবিক নীরব।

বর্তমানে আমেরিকার যুগ্ম অস্ত্রাদির কর্মসূচীতে পশ্চিম জার্মানী খুবই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। সেখানে গবেষণা চালানো হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য, যার মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটার পরিবর্তে দুটো যুগ্ম বিষাক্ত শক্তি গঠিত হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ন্যাটোভুক্ত দেশের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করে চলেছে নতুন রাসায়নিক অস্ত্রাদি সরবরাহ পদ্ধতির উন্নতির জন্য কর্মপরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে। এটা শুধু ঘটনার যোগাযোগ নয় যে

রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহারের কার্যকারিতার হিসেব, যা বিবৃত হয়েছে মার্কিন সামরিক ম্যানুয়াল-এ, তাতে ধরা হয়েছে যে পশ্চিম জার্মানীর ভূখণ্ডে সেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে। ইউরোপীয় মঞ্চে পশ্চিম জার্মানী হচ্ছে ন্যাটোর অগ্রস্থ সামরিক শিবির ; এবং আমেরিকানরা ইউরোপে রাসায়নিক যুদ্ধ সংঘটিত করার জন্য ঐ দেশকে যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত করতে চাইছে। বাস্তবিকই, চলতি পরিকল্পনা পশ্চিম জার্মানীতে স্থাপন করতে চাইছে পাঁচটা লড়াই করার জন্য রাসায়নিক মজুত-ভাণ্ডার যার মধ্যে বর্তমান অস্ত্রাদির মধ্যে যুগ্ম অস্ত্রাদিও থাকবে ; এছাড়াও সেখানে স্থাপন করতে চাইছে নূতন রাসায়নিক অস্ত্রাদি সরবরাহ পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য হবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং তার মিত্রশক্তির ভূখণ্ডের উপর আঘাত হানা। পশ্চিম জার্মানী এইভাবে ইউরোপে পেন্টাগণের রাসায়নিক যুদ্ধের প্রধান প্রতিভূতে পরিগণিত হচ্ছে। তবে পশ্চিম জার্মানী শুধু একাই নয়, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহও প্রতিভূ হবে, যদি রাসায়নিক যুদ্ধ কখনো অভ্রপ্রকাশ করে পুরোনো বিশ্বে।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলও এই রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহারের ভীতির মুখোমুখি হচ্ছে, কারণ অতিদ্রুত সন্নিবেশের মার্কিন বাহিনী এই রাসায়নিক অস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত এবং তারা ওগুলো যথাযথ ব্যবহারের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিচ্ছে, সবচেয়ে বেশি করে আঞ্চলিক সংঘর্ষে অংশ নিয়ে, উন্নতিশীল দেশে সামরিক ব্যক্তি এবং অসামরিক জনসংখ্যার মধ্যে হতাহতের সংখ্যা হবে অনেক বেশী, কারণ ওইসব দেশে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা মাধ্যমের যথেষ্ট অভাব আছে এবং বাস্তবিক পক্ষে তাদের অসামরিক প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

আমেরিকান সাংবাদিক স্টারলিং সিগ্রেভ তাঁর "হলুদ বৃষ্টি ঃ রাসায়নিক যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে ভ্রমণ" বইতে লিখেছেন ঃ "লোহালক্কড়ের একটা খণ্ড হিসেবে একটা দ্বি-উপাদানজাত অস্ত্রকে স্নায়বিক পদার্থ দিয়ে পূর্ণ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। দ্বি-উপাদানজাত গঠনের যে কোন অতিবিষাক্ত পদার্থ ভর্তি করা যেতে পারে—যথা, বায়োটক্সিন জাতীয় অতি বিষাক্ত পদার্থ যেটা বহুগুণ মারাত্মক স্নায়বিক পদার্থের চেয়ে—এবং যেটা জনসাধারণের মতামতকে অগ্রাহ্য করে কিন্তু কম্যাণ্ডারদের মর্জিমাফিক ব্যাপকহারে ভর্তি করা হয়।…

"যুগ্ম অস্ত্র সম্পর্কে বলা হয় যে সেটা ব্যবহার করা হবে দুই-অংশের স্নায়বিক পদার্থের জন্য। সেটা না হয়ে শেষপর্যন্ত এমনও হতে পারে যে সেটা ব্যবহার করা হবে জৈব বিষ ধরে রাখার জন্য। জৈব বিষ না হয়ে এমনকি নরকুল-ধ্বংসকারী অস্ত্রও হতে পারে, যে-অস্ত্রের মাধ্যম হচ্ছে প্রজননগতভাবে নিবদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ।…

"একটা দৃঢ়সংবদ্ধ দ্রুতগতিসম্পন্ন, আঘাতকারী যুগ্ম অস্ত্র আরো অনেক বেশি

বাধা সৃষ্টি করবে। এ-ধরনের একটি আঘাতকারী শক্তিকে যদি ক্ষুদ্র, পরিশীলিত ও বিমানপরিবহণসাধ্য রাখা যায় এবং তাকে যদি সজ্জিত করা যায় সর্বাধিক উন্নত ও বহুউদ্দেশ্যসাধক যুগ্ম যৌগ দিয়ে এবং যুগ্ম ক্ষেপণাস্ত্র সমেত সবচেয়ে অগ্রসর ধারক দিয়ে, তাহলে সশস্ত্র বাহিনী লাভ করতে পারে সর্বাধিক রাসায়নিক প্রস্তুতি…"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্রের রণ-নীতি সমগ্র মানবজাতির পক্ষে আশঙ্কাজনক।

রাসায়নিক যুদ্ধের আশঙ্কা অবশ্যই দূর করতে হবে

মানবজাতির জীবন থেকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং তাদের উৎখাত করার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা তা সম্প্রতি যুদ্ধভীতিকে অপসারণ করতে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে সংযত রাখার সংগ্রামে একটা মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত বছরগুলোতে রাসায়নিক অস্ত্রাদি সংক্রান্ত সমস্যা নিউক্লিয়র অস্ত্রাদিজনিত ভীতি দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়, এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক জীবনে সবথেকে জরুরী এবং প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে সর্বদাই ছিল এবং এখনো আছে।

রাসায়নিক এবং জীবাণু যুদ্ধের পরিণতি দেখে বিভিন্ন দেশ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ১৯২৫ সালে যখন স্বাক্ষরিত হয়েছিল জেনিভা চুক্তি। ওই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তি এখনও পর্যন্ত কার্যকরী আছে, যা রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র-সমূহের ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে; যদিও এটা দুর্ভাগ্যক্রমে রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন, উন্নতি ও মজুত এবং তাদের সরবরাহ পদ্ধতিকে বাধা দিতে এবং বাতিল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও, ঊর্ধমুখী রাসায়নিক ভীতিকে বাধা দান করতে ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার একটা শক্ত রাজনৈতিক এবং আইনসিদ্ধ ভিত্তিভূমি স্থাপন করেছিল এই চুক্তি।

১৯৫২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দিল যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের উচিত জেনিভা চুক্তিকে মেনে নেওয়ার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকে, যারা তখনও বাইরে ছিল, উদ্বুদ্ধ করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশসমূহ কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদকে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বাধা দিল। সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তে একই আবেদন সমর্থন করল রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা ১৯৬৬ সালে। তারপর থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ দৃঢ়ভাবে বারবার এই আবেদন রেখেছে সমস্ত রাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়ে। এই একই ধরনের সিদ্ধান্ত আরও একবার সাধারণ সভা গ্রহণ করল ১৯৮৫ সালে তার ৪০-তম অধিবেশনে।

বর্তমানে জেনিভা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১০৩। সোভিয়েত ইউনিয়নই এই সব দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম জেনিভা চুক্তিতে স্বাক্ষর-দান করেছিল, এবং চুক্তির প্রতি ব্যাপক কার্যকর আনুগত্য নিশ্চিত করতে স্পষ্টতঃই এর প্রচেষ্টা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০ বছর ধরে এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল। অবশেষে,

১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘন ঘন আবেদনের ফলে, সারা বিশ্বব্যাপী জনমতের প্রবল চাপের ফলে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম ও ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত আতঙ্কজনক প্রামাণ্য ঘটনার উন্মোচনের ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিতে যোগদান করতে রাজী হল। এমন কি, এটা করার পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু কিছু ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদি ব্যবহার করার স্বাধীনতাকে ধরে রাখতে চাইল। জেনিভা চুক্তি বলবৎ করণের উপর একটা মন্তব্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক সৈন্য শিবিরের এবং ছাউনির কাছে অথবা তার চারপাশের নিকটবর্তী প্রতিরক্ষামূলক পরিসীমার মধ্যে গাছপালা রোধ করার জন্য রাসায়নিক উদ্ভিদবিনষ্টকারী পদার্থ ব্যবহারের অধিকার ধরে রাখতে চেয়েছিল এবং সেই সঙ্গে চেয়েছিল প্রতিরক্ষা-মূলক সামরিক উদ্দেশ্যে হাঙ্গামা দমনকারী শক্তির ব্যবহার। যদি বিবেচনা করা হয় যে, এমন কি শান্তির সময়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ও সৈন্য শিবির সারা বিশ্বে ছড়ানো ডজন ডজন দেশে ঘাঁটি গেড়ে আছে এবং বিষাক্ত শক্তির প্রতিরক্ষামূলক ব্যবহার নির্ধারিত হবে মার্কিনী জেনারেলদের দ্বারা, তাহলে একথা হৃদয়ঙ্গম করা শক্ত হবে না যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তির অংশীদার হবার পরেও ওয়াশিংটনের রাসায়নিক অস্ত্রাদি নীতির ফলে জনগণের সামনে ভীতির একটা পরিধি সে টেনে রেখেছে।

১৯৬৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্রশক্তিরা জীবাণুসৃষ্টিকারী এবং রাসায়নিক অস্ত্রাদির সমস্যার একটা মৌলিক সমাধানের ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করল। ওই প্রস্তাবে এই দুই ধরনের ব্যাপকহারে ধ্বংসসাধন-কারী অস্ত্রাদির উৎপাদন, যেগুলি তথাকথিত "নিঃশব্দ অস্ত্রাদি" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদকরণের দাবী জানানো হয়েছে। এই বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনের একটা বিশেষ খসড়া রাষ্ট্রপুঞ্জকে তার বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোভুক্ত তার কতিপয় মিত্রশক্তি, যারা রাসায়নিক অস্ত্রাদির ভোগদখলের অধিকার পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, প্রস্তাব দিল যে প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র জীবাণু-সৃষ্টিকারী অস্ত্রাদির উপরই চুক্তিতে পৌঁছানো যাবে। রাসায়নিক অস্ত্রাদির উচ্ছেদকরণে কতিপয় পশ্চিমী দেশের অনীহার পরিপ্রেক্ষিতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহ এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার একটা আশু, কমপক্ষে একটা আংশিক সমাধান বের করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, রোগজীবাণুমূলক এবং বিষাক্ত অস্ত্রাদির উৎপাদন, উন্নতি এবং মজুতের নিষিদ্ধকরণের উপর ও তাদের ধ্বংসের উপর, একটা চুক্তি সম্পন্ন করতে রাজী হল। ওই চুক্তিটি যেটি ১৯৭৫ সালে কার্যকরী হল, সেটি হল যুদ্ধোত্তর ইতিহাসে প্রথম প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ পদক্ষেপ; যার ফলস্বরূপ হল রাষ্ট্রসমূহের

অস্ত্রাগার থেকে একটি সম্পূর্ণ শ্রেণীর মারাত্মক গণবিধ্বংসী অস্ত্রাদির অপসারণ এবং ধ্বংসসাধন। চুক্তির অনুমোদন সম্পন্ন করে সোভিয়েত, মার্কিন এবং ব্রিটিশ সরকার এই মর্মে একটা যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করল যে তাদের রোগজীবাণু সৃষ্টি-কারী অস্ত্রের, বিষাক্ত পদার্থের এবং অনুরূপ সম্পর্কযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম অথবা তাদের সরবরাহ মধ্যোমের জন্য কোন মজুত-ভাণ্ডার নেই।

১৯৭২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও মজুতকরণ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের ধ্বংসসাধন-এর ব্যাপারে নিরস্ত্রীকরণের উপর একটা খসড়া চুক্তি জেনিভা কমিটির নিকট পেশ করল। এই ধরনের চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে খসড়াটি আবেদন জানাল যে তারা যেন এমন ধরনের ও এমন পরিমাণের রাসায়নিক শক্তির উৎপাদন, সম্প্রসারণ, মজুতকরণ অথবা অন্য কোন উপায়ে অধিগ্রহণ অথবা সংরক্ষণের কাজে লিপ্ত না থাকে, যাদের শান্তির উদ্দেশ্যে কোন প্রয়োজনই নেই ; সেই সঙ্গে খসড়ায় আবেদন জানানো হল আক্রমণের উদ্দেশ্যে অথবা সামরিক সংঘর্ষে রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে অস্ত্রাদি, সাজ-সরঞ্জাম অথবা সরবরাহ মাধ্যমের অগ্রগতির কাজে নিয়োজিত না থাকতে। খসড়ায় আরও ছিল চুক্তি মানা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এবং তার জন্য ব্যবহার করার কথা ছিল জাতীয় কারিগরী উপায় ও তৎসহ আন্তর্জাতিক প্রণালী।

তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চুক্তির জন্য কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে সত্যাসত্যের আন্তর্জাতিক যাচাই সম্পর্কে কিছু শর্ত আরোপ করল। আগে থেকেই জানা ছিল যে শর্তগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আরও চাইল নিষেধাজ্ঞা থেকে বিশেষ কিছু ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদিকে (ভিয়েতনামে ব্যাপক পরিমাণে যে পঙ্গুতা সৃষ্টিকারী পদার্থ তারা ব্যবহার করেছিল) মুক্ত রাখতে। এই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক যুদ্ধের সমস্ত উপকরণকে নিষিদ্ধ করার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সব থেকে ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদি বাতিল করার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। এই বিষয়ের উপর একটা যৌথ উদ্যোগ সম্বন্ধীয় চুক্তি নথিভুক্ত হয়েছিল একটা যুগ্ম সরকারী ঘোষণায় যেটা প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েত-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলনের শেষে।

১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কথাবার্তা শুরু করল রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ-গ্রহণ বিষয়ে। কথা ছিল সেটি নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে গঠিত জেনিভা কমিটির নিকট পেশ করা হবে। রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর একটা সর্বাঙ্গীণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজনে তাদের আলোচনা একটা সমঝোতায় পৌঁছাল এবং

একটা চুক্তির খসড়ার অন্তর্ভুক্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে মতবিরোধ কমিয়ে আনল। তবে ১৯৮০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র-প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিকের সম্বন্ধে চলতে থাকা অন্য কয়েকটি কথাবার্তার সঙ্গে এই কথাবার্তাও ভেঙে দিল। এটা ছিল সেই সময় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রেগন প্রশাসনের হোয়াইট হাউসে অধিষ্ঠানকালে শুরু করেছিল, একটা সুদূরপ্রসারী বিহ্বলকারী সমর-সজ্জার কর্মসূচী যেটা নূতন পারমাণবিক অস্ত্রাদি পদ্ধতির উন্নতি চেয়েছিল—দূর-পাল্লার এবং মাঝারি পাল্লার উভয় ক্ষেত্রেই মার্কিনী সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত করতে। এইসব সামরিক পরিকল্পনায় রাসায়নিক অস্ত্রাদি এবং নূতন যুগ্ম রাসায়নিক যৌগ পদার্থের উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অতীতের এই বছরগুলিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভা তার বাৎসরিক অধিবেশনে সমানে আলোচনা করে গেছে রাসায়নিক অস্ত্রাদিকে বাতিল করা এবং ধ্বংস করার সমস্যা নিয়ে, যেটা ছিল প্রধান অগ্রাধিকারী নিরস্ত্রীকরণ বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই বিষয়ের উপর সাধারণ সভা তার গৃহীত সিদ্ধান্তে অপরিবর্তনীয়ভাবে সাগ্রহ সমর্থন-পূর্বক উল্লেখ করেছিল যে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জেনিভা সম্মেলন (১৯৮৪-র আগে পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক কমিটি) রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদের ধ্বংসসাধনের উপর একটা চুক্তির খসড়া সম্পন্ন করতে তার প্রচেষ্টাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নিরস্ত্রীকরণের উপর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার প্রথম বিশেষ অধিবেশনের চূড়ান্ত দলিল, যেটা ১৯৭৮ সালের ৩০-শে জুন সর্বসম্মতিক্রমে (অর্থাৎ সর্বসম্মত চুক্তি দ্বারা) গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হল যে সর্বাগ্রগণ্য লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে রাসায়নিক অস্ত্রাদিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পাদন।

চলতি বছরগুলিতে, বিশেষ করে ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা চালাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্বীকার করার সময় থেকে, রাসায়নিক অস্ত্রাদি বাতিল করা সংক্রান্ত আলোচনা কেবলমাত্র নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক জেনিভা সম্মেলনেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেহেতু সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্য-রাষ্ট্রের যতটা সম্ভব শীঘ্র রাসায়নিক অস্ত্রাদির অবসান ঘটানোর ব্যাপারে আগ্রহ আছে সেইজন্য বিবেচনাধীন প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। মার্কিন প্রতিনিধিদের বিরোধিতা এমনকি সরাসরি বাধাদান সত্ত্বেও, সম্মেলন একটা বিশেষ কার্যকরীসমিতি স্থাপন করল যার কাজ হল রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর বিশেষভাবে একটা খসড়া আন্তর্জাতিক চুক্তি তৈরী করা। আর, এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক, নিরপেক্ষ এবং কিছু পশ্চিমী দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ তাদের আগ্রহ দেখাল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস্

এবং অন্য কিছু রাষ্ট্র এই খসড়া চুক্তির সম্বন্ধে তাদের আলাদা আলাদা প্রস্তাব এবং সুপারিশপত্র জমা দিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক সম্মেলনে ও রাষ্ট্রপুঞ্জে রাসায়নিক অস্ত্রাদি উৎখাত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন কসুর করছে না। ১৯৮২ সালের জুন মাসে নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা বিশদ দলিল হাজির করল, যার শিরোনাম হল ঃ "রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও মজুতকরণ-এর নিষিদ্ধকরণ এবং তাদের ধ্বংসসাধনের উপর একটি চুক্তির মৌলিক শর্তাদি।"

সোভিয়েত খসড়া চুক্তি অনুযায়ী, অংশগ্রহণকারীরা কখনোই এবং কোন অবস্থাতেই রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন, সম্প্রসারণ অথবা অন্য কোনভাবে অধিগ্রহণ, মজুতকরণ, রক্ষণ অথবা হস্তান্তর বা স্থানান্তরকরণের ভার গ্রহণ করবে না এবং এই ধরনের অস্ত্রাদির বর্তমান মজুতের ধ্বংসসাধন অনুমোদিত উদ্দেশ্যে অপসারণ করবে। এই খসড়ায় এমন বাধ্যবাধকতা ছিল যে অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপর যুগ্ম বা বহুউপাদানজাত অস্ত্রাদিসহ রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিয়োগ 'বন্ধ করতে হবে' এবং সমস্ত অন্যান্য রাষ্ট্রে যদি ইতিমধ্যেই রাসায়নিক অস্ত্র মোতায়েন হয়ে থাকে তবে সেগুলো অপসারণ করতে হবে।

চুক্তি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য মৌলিক শর্তাদির মধ্যে একটা ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা ছিল। এই বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থা অকুস্থলে নিয়মানুগ পরিদর্শন সহ জাতীয় যাচাই মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক পদ্ধতি-প্রকরণের একটা সংযুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক যাচাই পদ্ধতিগুলি, রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক পদ্ধতিগুলির ব্যবহারকে, সেই সঙ্গে অংশ-গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করবে, এবং চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা উপদেশক কমিটির কাজ-কর্মকে বিধিবদ্ধ করা হবে। চুক্তিপালন যাচাইয়ের তথ্যানুসন্ধানকারী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হল অকুস্থল পরিদর্শন যেটা অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের অনুরোধক্রমে "সন্দেহভাজন" রাষ্ট্রের সম্মতিসাপেক্ষে পরিচালিত হবে। এছাড়াও সদস্যরা নিয়মানুগ আন্তর্জাতিক অকুস্থল পরিদর্শনে রাজী হবে। একটা পূর্ণপরিবর্তিত বা বিশেষ সুবিধাযুক্ত মজুত-ভাণ্ডারের ধ্বংসকার্য এবং সেই সঙ্গে বিশেষ সুবিধাযুক্ত অনুমতিপ্রাপ্ত অতিবিষাক্ত মারাত্মক রাসায়নিকের উৎপাদন পরীক্ষা করার জন্য। চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যে কোন তদন্তে, সেটা নিরপত্তা পরিষদের উদ্যোগেও হতে পারে, সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকল, অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের অনুবিধি সাপেক্ষে, নিরাপত্তা পরিষদে নথিভুক্ত অভিযোগের ব্যাপারে বিভিন্ন ঘটনায় যখন এটা বিশ্বাস

করার যথেষ্ট কারণ আছে যে একটা সদস্য রাষ্ট্র চুক্তির শর্তাদি উদ্ভূত বাধ্যবাধকতাকে লঙ্ঘন করে কাজ করেছে বা করছে।

বর্তমানে এই দলিলটি নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সম্মেলনের সামনে আছে। সোভিয়েতের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হল সমস্ত ইতিবাচক মূলসূত্র যেগুলো এতদিন পর্যন্ত মার্কিন-সোভিয়েত কথাবার্তার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্র যেগুলো প্রস্তাব দিয়েছে। সোভিয়েতের খসড়া আগাম চুক্তির জন্য একটা শক্ত বুনিয়াদ স্থাপন করে সমস্যার সমস্ত দিকের উপর, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সত্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারটি যেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশসমূহ সর্বদাই একটা পরিকল্পিত ছুতো হিসাবে উত্থাপন করছে রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করার জন্য।

আলাপ-আলোচনার উন্নতি ঘটাবার জন্য এবং সম্মেলনে একটা খসড়া চুক্তির উপর ঐক্যমতকে সহজসাধ্য করে তোলার জন্য, ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন অতিরিক্ত গঠনমূলক প্রস্তাবের একটা অনুক্রম পেশ করল—যেমন, মজুত-ভাণ্ডারের এবং যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির মজুত ও উৎপাদনের সুবিধার দ্রুত ধ্বংসসাধন, রাসায়নিক উৎপাদনের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ, বিশেষ করে বাণিজ্যিক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে রাসায়নিক অস্ত্রাদি নির্মাণে যার কার্যকর ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক ; রাসায়নিক গোলাবারুদের পরিমাণ, টাইপ ও রাসায়নিকের নাম উল্লেখ করে রাসায়নিক অস্ত্রাদির মজুত-ভাণ্ডারের বিশদ বিবরণদান।

উপরন্তু, ১৯৮৪ সালে কথাবার্তা চলার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যতা যাচাইয়ের সম্পর্কে নূতন সুদূরপ্রসারী প্রস্তাবসমূহের প্রবর্তন করেছিল। সোভিয়েত প্রতিনিধি প্রস্তাব দিয়েছিল যে সবচেয়ে ভয়ংকর ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদির ধ্বংস সম্বন্ধীয় সমস্ত অগ্রগমনের প্রতি অবিরাম আন্তর্জাতিক সদাসতর্ক দৃষ্টিদানের জন্য একটা শর্ত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হোক। এই উদ্যোগটি ঐক্যমতে পৌঁছাতে দ্রুত অগ্রগতির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

১৯২৫ সালের জেনিভা চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শাসনতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য, যেটা রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দিল যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে অঙ্গীভূত করা এবং উপযুক্ত সত্যতা যাচাইয়ের পদ্ধতি স্থাপন করা যেটা এর ঐক্যমত স্থাপনের অনুরোধক্রমে স্বেচ্ছায় অকুস্থল পরিদর্শন-এর অন্তর্ভুক্ত চুক্তির দ্রুত রূপায়ণ এবং সমাপ্তি রাসায়নিক ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটা সম্পূর্ণ এবং একেবারে নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

অনেক ব্যাপারে বেশ কিছু মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও, সম্মেলন একটা ভবিষ্যৎ চুক্তির জন্য বিশেষ কিছু শর্তাদির বিশদ ব্যাখ্যা করতে পূর্ণোদ্যমে কাজে হাত

লাগাল। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে এই ব্যাপারে অনেক কিছুই সম্পাদিত হোল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহের অবিরাম প্রচেষ্টায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছুটা অগ্রগতি সম্ভবপর হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ চুক্তির খসড়া সম্পাদন করার জন্য এগিয়ে আসতে চাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটোভুক্ত মিত্র দেশসমূহের তরফে রাজনৈতিক ইচ্ছা যদি থাকত তাহলে চুক্তির মূল সূত্রগুলির যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছান যেত। তবুও, এখনো পর্যন্ত এটা সম্ভব হয় নি, কারণ হল ওয়াশিংটন অনুসৃত কূটনীতি যার উদ্দেশ্য যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদি উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচী চালু করার ব্যাপারে তার কর্ম-স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

নূতন যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির পদ্ধতি-প্রকরণ অর্জনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে, যেটা সে সামরিক আধিপত্য অর্জনের আর একটা উপায় বলে মনে করছে, রেগন প্রশাসন রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণের ব্যাপারে একটা চুক্তির খসড়াকে বাধা দিতে সচেষ্ট হয়েছে। যে দৃষ্টিভঙ্গী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপুঞ্জে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত জেনিভা সম্মেলনে এবং অন্য যে কোন স্থানে গ্রহণ করে ছিল তার পরিষ্কার লক্ষ্য ছিল এটাই।

১৯৮০ সালে রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্পর্কে মার্কিন-সোভিয়েত কথাবার্তা স্থগিত হয়ে যাবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল এ-ব্যাপারে জেনিভা সম্মেলন যাতে কোন বাস্তব কাজ করতে না পারে তার জন্য বাধা দান করতে। একটা গ্রহণযোগ্য খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করার জন্য একটা বিশেষ কার্যকরী সমিতির গঠন বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রতিনিধিরা সম্ভাব্য সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করেছিল ; সম্মেলনে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত রাখতে চেয়েছিল কেবলমাত্র রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদির সার্বিক "সত্যতা প্রমাণের ধারণা" সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোচনা নিবদ্ধ করে। ১৯৮০ সালে কার্যকরী সমিতি এবং তারপর ১৯৮৪ সালে সমন্বয়কারী সমিতি গঠনের পর যখন চুক্তির সত্যিকারের খসড়া আরম্ভ করা হল, তখন মার্কিন প্রতিনিধি হয় এই ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করলো অথবা 'সত্যতা যাচাইয়ের' বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এটাকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করল।

একটা চুক্তি রচনা করার প্রচেষ্টাকে খোলাখুলি বানচাল করার দীর্ঘকালীন নীতি যেহেতু ক্রমবর্ধমানভাবে অ-ফলপ্রসূ ছিল, ওয়াশিংটন তাই সম্মেলনে কিছু রাজনৈতিক অলীক কৌশলের আশ্রয় নিল, যার উদ্দেশ্য ছিল জেনিভা আলোচনার প্রতি অধিকতর গঠনমূলক বিচারের দিকে তার অবস্থানে "পরিবর্তন" প্রদর্শন এবং চুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে তার আপাত "ইচ্ছা" প্রকাশ। এই উদ্দেশ্য মনে রেখেই ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত

সম্মেলনে তার নিজস্ব খসড়া চুক্তি পেশ করেছিল। এই খসড়া চুক্তি ব্যাপক প্রচারলাভ করেছে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার সমস্যার দিকে মার্কিন প্রশাসনের নতুন প্রয়াস হিসাবে। অথচ খসড়াটি এমন ভাষায় নিবদ্ধ যে যে-কেউ এই সমস্ত অস্ত্রের বিলোপসাধন সম্পর্কে এবং বিশেষ করে সত্যতা-যাচাইয়ের সমস্যা সম্পর্কে প্রকৃতই ভাবিত তার কাছে আগে থেকেই অ-গ্রহণীয় হয়ে পড়ে।

মার্কিনী খসড়ায় সত্যতা যাচাইয়ের অনুবিধিগুলি সমস্ত যুক্তিগ্রাহ্য সীমারেখার বাইরে চলে যায় এবং যদি সেগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তবে সেগুলো চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণভাবে রাসায়নিক উৎপাদনের স্বার্থকে বিপদাপন্ন করবে তাই নয়, তাদের সার্বভৌমত্বকেও লঙ্ঘন করবে। খসড়ায় বলা হয়েছে, অবাধ আমন্ত্রণের ভিত্তিতে বিদেশী পরিদর্শকরা পরিদর্শন করতে পারবেন, যাদেরকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে যে কোন জায়গায়, প্রতিষ্ঠানে, গুদামে অথবা কোন সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশাধিকার দিতে হবে—সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকলেও। এইভাবে মার্কিন গোষ্ঠী সম্মেলনে পূর্বগৃহীত "সন্দেহভাজনের ক্ষেত্রে পরিদর্শনের" নীতিকে বাতিল করল। আরও ব্যাপার হল, অবাধ আমন্ত্রণমূলক পরিদর্শনগুলি কেবলমাত্র সরকারী মালিকানাধীন এবং সরকারী পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, মার্কিনী সত্যতা যাচাইয়ের প্রস্তাব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্ত হবে, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রশক্তিদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প কোম্পানীগুলিকে সত্যতা যাচাই পদ্ধতির বাইরে রাখা হচ্ছে। মার্কিনী খসড়ার এইসব অনুবিধি রাষ্ট্রপুঞ্জে সম্মিলিতভাবে গৃহীত নীতির সুস্পষ্ট পরিপন্থী, যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নীতি অনুযায়ী সত্যতা যাচাইয়ের বিধান নিরস্ত্রীকরণ বিধানের সমতুল্য। ওয়াশিংটনের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হল চুক্তিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে গোপন সামরিক এবং বাণিজ্যিক সংবাদ প্রকাশ করানো যা রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন, মজুত-করণ এবং সংরক্ষণের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন; এবং বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের কাজকর্ম বিঘ্নিত করা। সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাসায়নিক অস্ত্রাদি, বিশেষ করে অত্যাধুনিক ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদি উৎপাদনের জন্য, এমনকি সম্মেলনের চুক্তি অনুসারেও, একটা শিল্পের ভিত্তিভূমি নিজ অধিকার ধরে রাখার জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। সেইজন্য সে অস্বীকার করেছে সোভিয়েত প্রস্তাব গ্রহণ করতে যে প্রস্তাব অনুযায়ী সবথেকে ভয়ংকর অতিবিষাক্ত মারাত্মক রাসায়নিকের সীমিত পরিমাণের অনুমোদিত উৎপাদন প্রত্যেক দেশে একটা একক বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হবে এবং যেটা নিয়মানুগ আন্তর্জাতিক পরিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে যে সে যখন এবং যেখানে খুশি এই রাসায়নিকের উৎপাদন ঘটাতে সক্ষম হবে। ঠিক পূর্বের ন্যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর

ব্যাপকহারে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে দৃঢ়তাপূর্ণভাবে এই কথা বলে যে সামরিক বাহিনীর পত্রবিনষ্টকারী পদার্থের ব্যবহারকে এবং সশস্ত্র ও অন্যান্য ধরনের সংঘর্ষে প্রদাহসৃষ্টিকারী পদার্থের ব্যবহারকে এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মার্কিনী খসড়া চুক্তি যে অন্যান্য দেশের কাছে অ-গ্রহণীয় সেটা আগেই জানা ছিল, সেই চুক্তি উপস্থাপনের সঙ্গে একটা বিবৃতিতে মার্কিন উপ-রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ বললেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আধুনিক রাসায়নিক অস্ত্রাদির (অর্থাৎ যুগ্ম ব্যবস্থার) উৎপাদন আরম্ভ করবে যদি-না তাদের প্রস্তাবিত সর্বাঙ্গীণ নিষেধাজ্ঞার উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিবৃতিটা ছিল আলাপ-আলোচনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এবং দ্রুত রাসায়নিক পুনরস্ত্রীকরণের কর্মসূচী চালু করার ক্ষেত্রে মিথ্যা ওজর হিসাবে জেনিভায় অগ্রগতির ঘাটতিকে ব্যবহার করার ব্যাপারে মার্কিনী ইচ্ছার একটা প্রতিফলন; এবং সেটা আরও এই কারণে যে মার্কিন প্রশাসন এই কর্মসূচীর জন্য কংগ্রেসের আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রভূত অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল।

রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় বিচার্য বিষয়গুলি যতই জটিল হোক না কেন, এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে স্থায়ী অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ দেখতে পাওয়া যাবে সত্যতা যাচাইয়ের বিধানের উপর যে ঐক্যমত তার প্রতি অলঙ্ঘ্যনীয় প্রায়োগিক বাধার মধ্যে নয় অথবা একটা চুক্তির খসড়ার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রায়োগিক ব্যাপার সমাধান করার অক্ষমতার মধ্যে নয় যেটা সাধারণতঃ পশ্চিমের দেশসমূহে দাবী করা হয়। পরিবর্তে, কারণগুলি ওয়াশিংটনের কর্মপন্থার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কোনপ্রকার স্বার্থ দেখতে না পেয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর পরিষ্কার লক্ষ্য হল রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার অন্য আর একটা পেঁচালো আবর্তের মধ্যে মানবজাতির নিমজ্জন ঘটান।

এই নূতন মার্কিনী উদ্যোগ সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হল জেনিভা চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্য থেকে, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিছু মার্কিনী মিত্রশক্তি ও যারা কেবলমাত্র তাদের রাসায়নিক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে শুরু করল তাই নয়, রাসায়নিক অস্ত্রাদি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে যে আলোচনা চলছিল তার ফল সম্বন্ধেও তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণ বিষয়ের উপর ওয়াশিংটনের বাধাদান নীতি ধূমায়িত অশান্তি এবং সমালোচনার সৃষ্টি করল নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে উভয় জায়গাতেই।

রাসায়নিক অস্ত্রাদি সংক্রান্ত আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশোভন এবং

অনুচিত কৌশলীপন্থাকে নিন্দা করার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্রচুক্তির ত্বরিৎ সম্পাদন টানার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে তার সুদৃঢ় ইচ্ছার কথা পুনরায় ব্যক্ত করেছে, যে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে একটা কার্যকরী সত্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা। আর এর সাফল্য নির্ভর করবে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের প্রচেষ্টার উপর। সোভিয়েত ইউনিয়নও প্রস্তুত আছে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে, যারা আন্তরিকভাবে এই সমস্যা সমাধানে আগ্রহী। সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে, জেনিভা সম্মেলনের সামনে সর্বাগ্রগণ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণ।

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী ক্রমবর্ধমানভাবে সনির্বন্ধ আহ্বান জানিয়ে আসছে যে রাসায়নিক অস্ত্রাদি নিষিদ্ধ এবং উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টাকে তীব্রতর করা হোক যেটা সাম্প্রতিক যুগ্ম অস্ত্রের সম্প্রসারণ এবং সান্নিবেশকরণকে বাধা দেবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৪০-তম অধিবেশনে এই বিষয়ের উপর যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে এটা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত এবং অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্যের দ্বারা গৃহীত (কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল একমাত্র দেশ যে নেতিবাচক ভোট দিয়েছিল) একটা সিদ্ধান্ত সমস্ত ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন, সম্প্রসারণ এবং মজুতকরণ-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদের ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে একটা চুক্তির দ্রুত রূপায়নের প্রয়োজনের কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে। সাধারণ সভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনকে একটা চুক্তির ব্যাপারে দ্রুত ঐক্যমতে পৌঁছবার জন্য আলাপ-আলোচনাকে তীব্রতর করার জন্য আবেদন জানিয়েছে। একদল সমাজ-তান্ত্রিক নিরপেক্ষ ও পশ্চিমী দেশের উদ্যোগে সাধারণ সভা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে একটা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যাতে জেনিভা সম্মেলনকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপরে একটা চুক্তির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

ইউরোপকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির কবল থেকে মুক্তি প্রদান

বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং তাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের অবিচল প্রয়াসকালে কিছুকাল হল সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ইউরোপেও রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কাজ করে যাচ্ছে। রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদকরণের ব্যাপারে এখনো যে একটা ঐক্যমতে পৌঁছানো যায় নি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্ররা ১৯৮৩ সালের মার্চে প্রাগের রাজনৈতিক ঘোষণায় ইউরোপকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির কবল থেকে মুক্তি দেবার একটা প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এই প্রস্তাবের সমর্থনে ইউরোপের ব্যাপক অঞ্চল এবং বিশ্ব নাগরিকদের তরফ থেকে প্রচণ্ড একটা সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তাদের প্রাগে গৃহীত প্রস্তাবের অনুষঙ্গ কার্যক্রম হিসাবে এতে বিশেষ বিশেষ কিছু সংশোধন বিবেচনার জন্য পেশ করল। তারা ন্যাটোভুক্ত সদস্য দেশসমূহকে প্রস্তাব দিল যে ১৯৮৪ সালে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের একটা মিটিং ডাকা হোক ইউরোপকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আলাপ-আলোচনার বাস্তব দিকের ব্যাপারে ঐক্যমতে যাতে পৌঁছানো যায়। এই প্রস্তাব ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত এবং ন্যাটোভুক্ত সদস্য রাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ডাক দিল। কিন্তু ন্যাটোভুক্ত দেশসমূহ এই শান্তি উদ্যোগের প্রচেষ্টাকে একটা আনুষ্ঠানিক উত্তর দেবার প্রয়োজনও বোধ করল না।

১৯৮৪ সালের মে মাসে আস্থা এবং নিরাপত্তা তৈরীর পদক্ষেপ সম্পর্কে এবং ইউরোপে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে স্টকহোম সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব দিল যে এই মহাদেশকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির হাত থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আস্থা এবং নিরাপত্তা গঠনের পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে।

ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটি ১৯৮৫-র অক্টোবরে সোফিয়াতে যে বিবৃতি দিয়েছিল সেটা ইউরোপকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির কবল থেকে মুক্তিদানের জন্য প্রত্যক্ষ কথাবার্তা চালাবার উপরে ন্যাটোভুক্ত দেশ-সমূহকে আবেদন জানিয়ে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেই প্রস্তাবের কথাই পুনরাবৃত্তি করল। এই বিবৃতি জিডিআর এবং চেকোশ্লোভাকিয়া সরকারের

প্রচেষ্টাকেও সমর্থন জানাল, যে প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল মধ্য ইউরোপে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহারমুক্ত একটা অঞ্চল বিধিবদ্ধ করা।

১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিডিআর ও চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার তাদের এই উদ্যোগকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করল, যখন তারা অনুরূপ একটা মুক্তাঞ্চল বিধিবদ্ধ করার জন্য কথাবার্তা চালাতে এফআরজি সরকারকে প্রস্তাব দিল। তাদের এই প্রচেষ্টা বা উদ্যম এই তিন দেশের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পন্ন করার দাবি জানাল, যেটা মধ্য ইউরোপে এই তিন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্পূর্ণ উচ্ছেদকরণ, উপযুক্ত সত্যতা যাচাই পদ্ধতির তত্ত্বাবধানে, সম্ভবপর করবে।

দুই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা গৃহীত এই শান্তি উদ্যোগ, যেটা ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সুস্পষ্টভাবে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, জনমতের বিরাট অংশের এবং ইউরোপীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা বিরাট আগ্রহের সঞ্চার করল। কেননা বাস্তব ঘটনা হল এই যে ইউরোপের দুই রাজনৈতিক ও সামরিক সন্ধি—ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তির মধ্যে সংযোগকারী রেখা বরাবর মধ্য ইউরোপে সামরিক বাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের সন্নিবেশ বিশেষ করে খুবই ব্যাপক। অতএব, ওই এলাকা থেকে রাসায়নিক অস্ত্রাদির অপসারণ বাস্তবিকভাবে সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনাকে অনেকটা কমিয়ে দেবে এবং ওই দুই সামরিক সন্ধির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ফলপ্রসূভাবে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আর, এইটা করার ব্যাপারে একটা ঐক্যমত ইউরোপের নিরাপত্তা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং ইউরোপীয় মহাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ভয়াবহ এবং অজানা সব পরিণাম সৃষ্টিকারী রাসায়নিক যুদ্ধের ভীতিকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে একটা প্রধান পদক্ষেপ রূপে বিবেচিত হবে। ওই একই সময়ে দু'পক্ষের কেউই কোন সুবিধা ভোগ করতে পারছে না। বরং ন্যাটো এবং ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় আরো অনেক ছোটমাত্রার সামরিক সংঘর্ষে।

ওয়াশিংটনের যুগ্ম অস্ত্রাদি, যেটা হল একটা নূতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র, উৎপাদনের ঘোষিত পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ইউরোপ থেকে রাসায়নিক অস্ত্রাদি অপসরণের সমস্যা একটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। ফলস্বরূপ, ইউরোপে এই নূতন ধরনের মারাত্মক অস্ত্রাদির সন্নিবেশ ও সম্প্রসারণে বাধাদানের জন্য ত্বরিত পদক্ষেপ নেওয়ার সপক্ষে ইউরোপীয় জনসাধারণের বিরাট অংশের মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান আকাঙ্খা ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সেইজন্য ইউরোপীয় জনসাধারণ অবাধে আগ্রহ সহকারে জিডিআর ও চেকোশ্লোভাকিয়া সরকারের শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। বিভিন্ন বিশ্বাস ও রাজনৈতিক মতাবলম্বী ব্যক্তিরা ইউরোপীয় মহাদেশে যুদ্ধের ভীতিকে দূর করার এবং শান্তিকে শক্তিশালী

করার লক্ষ্যে এটাকে একটা শুভ ইঙ্গিত বলে মনে করেছে। আর এই উদ্যোগের আগে একটা সুবিস্তৃত আলোচনা হয়ে গিয়েছিল জার্মানীর সোসালিস্ট ইউনিটি পার্টি এবং সোসাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিদের মধ্যে যারা মধ্য ইউরোপে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহারমুক্ত একটা অঞ্চল স্থাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার-বিবেচনা করেছিল।

জিডিআর ও চেকোশ্লোভাকিয়ার এই প্রস্তাবকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন জানিয়েছে এবং বলেছে যে সেরকম কোন অঞ্চল যদি স্থাপিত হয় তবে সে ওই অঞ্চলের মর্যাদাকে নিরাপত্তা ও সম্মান দান করতে প্রস্তুত; তবে এই শর্তে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও এই একই ধরনের ইচ্ছা বা মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। উত্তর রাইন-ওয়েস্টফেলিয়ার মন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি এবং পশ্চিম জার্মানীর সোসাল ডেমক্রাটিক পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান জোহানেস রাউ-এর সঙ্গে এক বৈঠকে ১৯৮৫-র সেপ্টেম্বর মাসে সি. পি. এস. ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থান ঘোষণা করেছেন। ১৯৮৫ সালের ৩ অক্টোবর ফরাসী পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবার সময়ে সোভিয়েত নেতা ইউরোপের মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহারমুক্ত অঞ্চল স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছু করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইচ্ছার কথাটা আরো একবার দৃঢ়ভাবে বলেছেন।

এখনো পর্যন্ত ওয়াশিংটন এই দুই সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রের শান্তি উদ্যোগকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেছে। সে তার নেতিবাচক মনোভাবকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারধর্মী এইরূপ দৃঢ় ঘোষণা দ্বারা যে কেবল-মাত্র মধ্য ইউরোপে রাসায়নিক অস্ত্রাদি নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে সীমাবদ্ধ আলাপ-আলোচনা বিশ্বস্তরে রাসায়নিক অস্ত্রাদি নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলছে সেটাকে ব্যাহত করবে।

সত্যিকথা, বিশ্বব্যাপী রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ এবং উচ্ছেদ সাধনই হবে আদর্শ সমাধান। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশসমূহের নেতিবাচক মনোভাবের ফলে যতদিন পর্যন্ত এই বিষয়ের উপর একটা ঐক্যমতে পৌঁছানো না যায়, ততদিন পর্যন্ত রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের চরম লক্ষ্যে মধ্যবর্তী পদক্ষেপও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, জিডিআর ও চেকোশ্লোভাকিয়া প্রস্তাবিত উদ্যোগের প্রয়োগ রাসায়নিক অস্ত্রাদির সাধারণ নিষিদ্ধকরণ এবং তাদের মজুত-ভাণ্ডারের ধ্বংসসাধনের উপর একটা চুক্তি সম্পন্ন করার ব্যাপারে একটা অধিকতর অনুকূল রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের সৃষ্টি করবে।

মধ্য ইউরোপে, রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহারমুক্ত অঞ্চলের উপর গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি তার নেতিবাচক মনোভাবকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওয়াশিংটন সেই

গতানুগতিক অনমনীয়তার মুখাপেক্ষী হয়েছে—একটা সীমিত এলাকার মধ্যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণ যাচাই করা অসুবিধাজনক। হায়, ওয়াশিংটনের কাছে এটা একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে, প্রত্যেকবার যখনই অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি এবং নিরস্ত্রীকরণ কথাবার্তার ব্যাপারে সে কাজ করতে অনিচ্ছুক হয় তখনই সে এই অলঙ্ঘনীয় "সত্যতা যাচাই সংক্রান্ত অসুবিধার" দোহাই পাড়ে।

একইভাবে, মার্কিনী যুক্তি হল এই যে আলোচ্য অঞ্চল থেকে মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্রাদির অপসারণ 'ন্যাটো'-র বাধাদানের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেবে এবং পরমাণু যুদ্ধ সংঘটনের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে তুলবে। যেটা বাস্তবের মাপকাঠি দিয়ে মাপলে একটা বিশেষ ফাঁপা শব্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। এটা কেবল একটা প্রচারমূলক কৌশল মাত্র। "প্রতিরক্ষার লক্ষ্য" অথবা "বাধাদান" এইসব সংক্রান্ত কথাবার্তা কদাচিৎ কাউকে প্রভাবান্বিত করতে পারবে। যেটা আগেই আমরা ইঙ্গিত করেছি সেটা হল মার্কিনী এবং "ন্যাটো"-র রাসায়নিক অস্ত্রাদি সমাজতান্ত্রিক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাছে একটা আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে এবং সেগুলো প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নি। ওগুলো বরং মার্কিনী এবং "ন্যাটো"-র আক্রমণাত্মক সক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নিজেদেরকে তুলে ধরেছে।

যুগ্ম অস্ত্রাদি সৃষ্ট ভীতি থেকে মানুষকে রক্ষাকরন

যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যাপকহারে উৎপাদনের প্রস্তুতি, যেটা সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু রয়েছে, মার্কিন এবং বিশ্ব নাগরিকদের মধ্যে গুরুতর উদ্বেগ ও ক্রোধের সৃষ্টি করেছে। এই মনোভাবের প্রকাশ হিসেবে দেখা দিল রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধকরণের অন্য একটি খসড়া আইন, এবং সেটা ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে মার্কিন সেনেটে পেশ করা হল। এর পিছনে উদ্দেশ্যটা হল মার্কিন প্রশাসনের ১৫৫-এম. এম. যুগ্ম কামানের গোলা এবং বাইগেই বোমা উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনাকে বাধা দেওয়া।

যুগ্ম যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের জন্য উপযোজন নির্দিষ্ট করতে গিয়ে মার্কিন সেনেটের এডওয়ার্ড কেনেডি, গ্যারী হার্ট, উইলিয়ম প্রক্সমায়ার এবং অন্যান্যরা আর্মড সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান জন টাওয়ারকে লেখা একটা চিঠিতে মন্তব্য করেছেন যে তাঁদের ধারণা অনুযায়ী যুগ্ম যুদ্ধাস্ত্রের উৎপাদন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তাকে খুব একটা শক্তিশালী করবে না এবং জাতীয় প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার কালে দেখা হাবে যে ঐ অস্ত্রগুলোর খুব একটা প্রয়োজনও নেই।

সর্বোপরি পশ্চিম ইউরোপে যুগ্ম যুদ্ধাস্ত্র সন্নিবেশ করার মার্কিনী পরিকল্পনা খুব সম্ভবতঃ ইউরোপীয় জনসাধারণ এবং বহু রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটা সঙ্গত শঙ্কার সৃষ্টি করবে। হল্যাণ্ডের বিদেশ মন্ত্রী হ্যান্স ভ্যান ডেন ব্রোয়েক-এর মত অনুযায়ী, তাঁর সরকার তাদের ভূখণ্ডে মার্কিনী রাসায়নিক অস্ত্রাদির সন্নিবেশকরণ মেনে নিতে রাজী নয়। ডেনমার্কে'র নিরাপত্তা ও বৈদেশিক নীতিবিষয়কে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির কমিশনের চেয়ারম্যান এল. বাজ রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে সমর্থন জানালেন এবং ইউরোপে রাসায়নিক অস্ত্রাদির ব্যবহার মুক্ত অঞ্চল স্থাপনের অভিপ্রায়কে অনুমোদন করলেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বেশীর ভাগ সদস্য রাষ্ট্রের মনোভাব ব্যক্ত করে সুইডেনের বিদেশমন্ত্রী লেনার্ট বডস্ট্রম রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৪০-তম অধিবেশনে তাঁর ভাষণে বললেন ঃ "যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদি প্রস্তুতের পরিকল্পনা একটা সাংঘাতিক দুশ্চিন্তার কারণ"। অধিকাংশ রাষ্ট্র চিন্তিত হয়ে পড়ল এই ভেবে যে যুগ্ম অস্ত্রাদি তৈরীর পরিকল্পনা রাসায়নিক অস্ত্রাদি নিষিদ্ধ করতে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন করার পথে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ট্রিয়ার প্রতিনিধি হোহেনফেলনার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৩৯-তম অধিবেশনে প্রথম কমিটির

সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন ঃ "এটা বাস্তবিক খুবই দুঃখজনক ঘটনা হবে যদি রাসায়নিক অস্ত্রাদি সংক্রান্ত একটা চুক্তি সম্পাদিত হবার আগেই নূতন রাসায়নিক অস্ত্রাদির উন্নতি ঘটে যায় এবং পরিচিত রাসায়নিক শক্তির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এই সহজ সত্যটা সম্বন্ধে আমরা সবাই জ্ঞাত যে কোন অস্ত্রাদি ব্যাপকহারে সন্নিবেশ এবং সম্প্রসারণের পরে নয়, আগেই তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাটা সহজতর ব্যাপার।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণ এবং নির্মূলকরণের একজন উগ্র সমর্থক এবং একটা নিষ্ঠুরতম ও অমানবিক ধরনের যে রাসায়নিক অস্ত্র—যুগ্ম যুদ্ধাস্ত্র—তার তৈরীর পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধী। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ধরনের অস্ত্রাদির সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কোন গবেষণাকার্য কখনো চালনা করে নি।

যুগ্ম রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপকহারে উৎপাদনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার ব্যাপারে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জনসমক্ষে প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৮৫ সালের ১১ জুলাই "তাস" সংবাদসংস্থার মাধ্যমে, যার বক্তব্য হল ঃ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে গভীর শঙ্কা ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলবে। আর এই পদক্ষেপের ফলে যে পরিণতি ঘটবে তার সমস্ত দায়দায়িত্ব বর্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুগ্ম অস্ত্রাদির উৎপাদন ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনাকে কঠোরভাবে নিন্দা জানাচ্ছে। সমস্ত ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ এবং নির্মূলকরণের সমস্যার মৌলিক সমাধানকে সে অবিচলভাবে সমর্থন জানাচ্ছে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সমস্ত শান্তিকামী রাষ্ট্রকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার তৎপরতার কথা সে পুনঃপুন ভাবে বলছে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিচলভাবে সেই একই মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে সমস্ত আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভায় ও মত-বিনিময়ের স্থানে যেখানে রাসায়নিক অস্ত্রাদির সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রাগারে এই যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির সংযোজনকে বাধা দেবার জন্য এবং মানুষের কাছে একটা নূতন ও ভয়াবহ ভীতির সৃষ্টিকে বাধা দেবার জন্য সে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশেষভাবে বিশ্বাস করে যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির, তা সে যে কোন গড়নেরই হোক না কেন, বৃদ্ধির গতিকে বাধা দেবার জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গ্রহণই একটা সমাধান খুঁজে বের করতে পারে ওই প্রধান সমস্যার ব্যাপারে—যেটা হল রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্পূর্ণ বাতিলকরণ ও নির্মূলকরণ। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রান্স সফরের সময় মিখাইল গরবাচেভ পরামর্শ

দিলেন যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির সম্প্রসারণ বন্ধ করার জন্য একটা চুক্তি সম্পন্ন হোক যেমন হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্রাদির ক্ষেত্রে। বললেন ঃ "রাসায়নিক অস্ত্রাদির সংকোচনের ব্যাপারে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত থাকবে।"

সোভিয়েত ইউনিয়ন রাসায়নিক অস্ত্রাদির বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে রাজী হতে এবং রাসায়নিক অস্ত্রাদি উদ্ভূত সমস্ত রকম ভীতি থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে এবং রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায়, বিশেষ কার যুগ্ম অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আর একটা ঊর্ধ্বগতিকে এড়াতে সবসময়েই ইচ্ছুক। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ারশ চুক্তির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটির সোফিয়ার ঘোষণা এই সোভিয়েত নীতির যাথার্থ্যকে সমর্থন করেছে। ওই ঘোষণা আরও বলেছে যে বর্তমান অবস্থায় রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও তার মূলোচ্ছেদ সাধন, সেই সঙ্গে ভয়ংকর বিপজ্জনক যুগ্ম অস্ত্রাদির উপরও অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ, আরও অনেক বেশী সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

একটা নূতন পর্যায়ের মারাত্মক রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ওয়াশিংটনের ঘোষিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ কর্তৃক উত্থাপিত কতকগুলো সিদ্ধান্ত সম্প্রতি অনুমোদন করেছে, যেগুলো সমস্ত রাষ্ট্রকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে এমন সব কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকতে যার উদ্দেশ্য রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণের উপর আলাপ-আলোচনাকে বাধা দেওয়া এবং বিশেষ করে যুগ্ম ও অন্যান্য নূতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন ও সম্প্রসারণের গতিকে বাধা দেওয়া এবং সর্বোপরি অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপর রাসায়নিক অস্ত্রাদির জমায়েত করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপকে 'বাধা' দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হল একমাত্র দেশ যে এই সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে ভোট দিয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, নূতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদি উৎপাদনের কর্মসূচী হাতে নিয়ে, যেটা তারা চালু করতে চলেছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অন্তর্গত এমনকি সামান্যতম নৈতিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে স্বীকার করে নিতেও ওয়াশিংটন অনিচ্ছুক।

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাসায়নিক অস্ত্রাদি নিষিদ্ধকরণ এবং নির্মূলকরণের ব্যাপারে একটা চুক্তির খসড়া প্রণয়নকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট একই আবেদন রাখল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশসমূহ। সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ প্রস্তাব দিল যে রাসায়নিক অস্ত্রাদির উপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে সবিশেষভাবে যুগ্ম অস্ত্রাদির উপর এবং তাদের

প্রধান উপাদানসমূহের উপর ফলপ্রসূ নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত হোক। মার্কিন প্রতিনিধি কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল অবলম্বন করল। উদাহরণস্বরূপ. সে প্রত্যাখান করল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গৃহীত একটা প্রস্তাব যেটা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগের দাবি জানিয়েছিল কিছু রাসায়নিক যৌগের বাণিজ্যিক উৎপাদনের, যে যৌগের কোন শান্তিপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহার নেই কিন্তু সর্বদাই স্নায়বিক শক্তি এবং যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির প্রধান উপাদানের উৎপাদনের বুনিয়াদ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার ৪০-তম অধিবেশন অভাবিত সংখ্যাধিক ভোটের সমাজতান্ত্রিক ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ অনুমোদিত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যেটি যুগ্ম রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন ও তাদের মনোমত স্থানে সন্নিবেশকরণের উপর সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করল এবং সকল দেশকে নিষ্ঠা সহকারে ঐকান্তিক আলোচনা চালাবার জন্য তার আহ্বানকে আরও জোরালো করল এবং আবেদন রাখল এমন যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে যার 'উদ্দেশ্য' রাসায়নিক অস্ত্রাদির নিষিদ্ধকরণের উপর আলাপ-আলোচনাকে বাধা দেওয়া এবং বিরত থাকতে বিশেষ করে যুগ্ম ও অন্যান্য নূতন ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রাদির উৎপাদন ও সন্নিবেশকরণ থেকে এবং সর্বোপরি, অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের উপর রাসায়নিক অস্ত্রাদি স্থাপন থেকে।

আরো একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংঘ কর্তৃক গৃহীত নীতির বিরোধিতা করল এবং তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিল।

উপসংহার

নতুন যুগ্ম রাসানিক অস্ত্রের উন্নতিসাধনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপজ্জনক পরিকল্পনা করছে এবং রাসায়নিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বব্যাপী, সর্বোপরি সারা ইওরোপব্যাপী ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে।

ওয়াশিংটনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আরেক দফা রাসায়নিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু করা। এর ফলে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার সম্ভাবনা কমছে এবং সমগ্রভাবে সামরিক সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা বাড়ছে। এটা ঘটতে না দেওয়াতেই সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ। সারা বিশ্বের মানুষ চাইছে রাসায়নিক অস্ত্রের নিষিদ্ধকরণ বাস্তব হোক।

ওয়াশিংটনের যুগ্ম অস্ত্রের কর্মসূচী কার্যকর হওয়াটা সকল জাতির পক্ষে অশুভ আশঙ্কা। এই আশঙ্কা দূর করতে হলে অবশ্যই চাই যে-সব রাষ্ট্র ও শক্তি সমরবাদ ও যুদ্ধের বিরোধী এবং স্থায়ী ও নিশ্চিত শান্তির পরিপোষক তাদের প্রবল ও অবিচলিত সক্রিয়তা। অবশ্যই আরো চাই যে ওয়াশিংটন বাস্তবসম্মত বিচার গ্রহণ করুক এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামরিক বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হোক।

রাসায়নিক অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা এবং রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ চিরকালের জন্য ধ্বংস করা অবশ্যই সম্ভব, যেমনটি নির্দেশ করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রস্তাবগুলিতে। এই লক্ষ্যসাধনে দৃঢ় ও অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়েছে অতি বিপুলসংখ্যক রাষ্ট্র এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক ও জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলি।

প্রতি বছরেই জাতিসংঘ নতুন করে ডাক দিয়ে চলেছে যে রাসায়নিক অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও ধ্বংস করার জন্য অবিলম্বে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন হোক। এই ডাক সমর্থন করছেন জনমতের বিপুল অংশ, যাঁদের মধ্যে আছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা রাজনৈতিক পথ ও মতাবলম্বীরা, প্রখ্যাত রাজনীতিক ও জননেতারা, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ও সামরিক বিশেষজ্ঞরা।

১৯-২১ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখে জেনিভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের মধ্যে যে বৈঠক হয়েছে তার ফলাফল এই আশার জন্ম দিয়েছে যে ওয়াশিংটন হয়তো রাসায়নিক অস্ত্র-প্রতিযোগিতা নিবারণের

সমস্যা সম্পর্কে আরও বাস্তবসম্মত ও দায়িত্বপূর্ণ বিচার গ্রহণ করবে। বৈঠকের শেষে যে যৌথ সোভিয়েত-আমেরিকান বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে "উভয় পক্ষ নতুন করে অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা রাসায়নিক অস্ত্রের সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিবারণ এবং রাসায়নিক অস্ত্রের বিদ্যমান মজুদের ধ্বংশসাধনের পক্ষে। এ-বিষয়ে একটি কার্যকর ও প্রতিপ্রাদনীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আরও জোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে তাঁরা সম্মত হয়েছেন।" তাঁরা আরও সম্মত হয়েছেন যে রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ও তার সত্যতা নিরূপণের প্রশ্ন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা তাঁরা আরো বাড়িয়ে তুলবেন।

রাসায়নিক আশঙ্কা দূর করা যায় এবং অবশ্যই দূর করতে হবে।

এশিয়ার পক্ষে নিউক্লিয়র যুদ্ধের পরিণাম

আলেকসেই খাবারভ
আলেকজান্দার স্‌নেগিন

এশিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটিসমূহ এই অঞ্চলের দেশগুলির অস্তিত্বের পক্ষেই বিপদস্বরূপ

১৯৭০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর রণনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত এলাকায় তার সামরিক ঘাঁটি ও চৌকিগুলির নির্মাণ বাড়িয়ে চলেছে।

রেগন প্রশাসন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়ে এই প্রয়াসকে নিবিড় করে তুলেছে। আগামী পাঁচ বছরে ওয়াশিংটন বিদেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির জালবুনুনি সুসংহত ও প্রসারিত করা বাবদ তিন হাজার কোটি ডলার খরচ করবার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে দু'শো কোটি ডলার খরচ করা হবে শুধুমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও ভারত মহাসাগরেই সামরিক চৌকিগুলির জালবুনুনি নির্মাণ করবার জন্য।

আজকে ৩২টি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেড় হাজারের বেশি সামরিক ঘাঁটি, এগুলিতে পাঁচ লক্ষের বেশি আমেরিকান সামরিক কর্মী স্থায়ীভাবে মোতায়েন রয়েছে। একমাত্র ১৯৮২ সনেই এদের সংখ্যা প্রায় ছয় শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মোতায়েন রেখেছে প্রায় ১৬০টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে গঠিত নৌবহর, এগুলির মধ্যে রয়েছে ছয়টি আক্রমণকারী বিমানবাহী জাহাজ, কয়েক ডজন নিউক্লিয়র শক্তিচালিত সাবমেরিণ এবং প্রায় এক হাজার জঙ্গী বিমান।

এর সঙ্গে যোগ করা উচিত আমেরিকা ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে অবস্থিত এলাকাগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহ চালাবার উদ্দেশ্যে সংগঠিত দ্রুত মোতায়েনযোগ্য বাহিনীকে (আরডিএফ)। বর্তমানে এই বাহিনীর সৈনিক সংখ্যা তিন লক্ষ, প্রচলিত ও নিউক্লিয়র উভয়বিধ যুদ্ধ চালাবার উপযোগী করে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আর ডি এফ এর অধীনে রাখা হয়েছে বহু সংখ্যক বিমানবাহী জাহাজে মোতায়েন রাখা পরমাণু বোমা বহনে সমর্থক বিমান, রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বি-৫২ বোমারু বিমান ও অন্যান্য নিউক্লিয়র অস্ত্রবাহী বিমান। ১০৫ মিলিমিটার কামানগুলির স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে ১৫৫ মিলিমিটার কামান, এগুলি নিউক্লিয়র গোলা ছুঁড়তে সমর্থ। নৌ-সৈনিকদের বাহিনীগুলির হাতে রয়েছে নিউট্রন গোলা ছুঁড়তে সমর্থ হাউইটজারগুলি।

১৯৮৩, জানুয়ারি মাসে আরডিএফ-কে নবগঠিত সেণ্ট্রাল কম্যাণ্ডের (সেণ্টকম) অঙ্গ করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার ও ভারত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম অংশের ১৯টি রাষ্ট্র এর তৎপরতার ক্ষেত্রের আওতার মধ্যে পড়বে। আন্তর্জাতিক আইনের প্রাথমিক নিয়মগুলিও লঙ্ঘন করে গোটা অঞ্চলটিকে আমেরিকার "একান্ত জরুরী স্বার্থের" ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আরডিএফ-এর অধীনে বর্তমানে রয়েছে ৭০০টি বিমান এবং ২০ থেকে ৩০টি যুদ্ধ জাহাজ, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হবে।

মার্কিন সামরিক কর্মনীতির মৌল নীতিটি হল "বৃহত্তম নিরাপত্তা" অর্জন; প্রতিশোধাত্মক আঘাতকে তার নিজ ভূখণ্ড থেকে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার দিকে স্থানান্তরিত করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনুষ্যদ্বেষী কামনার মধ্যে এই নীতির অভিব্যক্তি ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ঘাঁটিগুলি এবং যুদ্ধবিগ্রহের সময় ব্যবহার্য মাল-মসলা ও গোলাবারুদ ইত্যাদি গুদামজাত করবার ঘাঁটিগুলি স্থাপন করতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে যতটা সম্ভব দূরে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশের সীমান্তের যতটা সম্ভব কাছাকাছি। বর্তমানে আমেরিকার যে চিন্তাধারাটি নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে সেটি হল মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার সমস্যাটির সমাধান করতে হবে আবিশ্ব পরিসরে, ক্ষেপণাস্ত্র বসাবার এলাকা হিসাবে এশিয়া এবং ওসিয়ানিয়ারও উল্লেখ করা হচ্ছে। পেণ্টাগনের রণনীতি বিশারদদের মতে, পশ্চিম ইউরোপ ও অতলান্তিক মহাসাগরের মত পূর্ব এশিয়া ও তৎসহ প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরকে অগ্রবর্তী ঘাঁটি-ভিত্তিক নিউক্লিয়র অস্ত্র-ব্যবস্থা বসাবার এলাকা হয়ে উঠতে হবে।

প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি উইলিয়াম জে. ক্রো দাবি করেছেন যে এই এলাকাগুলি "সম্ভাব্য আমেরিকান নিরাপত্তা অঞ্চল" যেখানে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মার্কিন নিউক্লিয়র ক্ষেপণাস্ত্রের উপস্থিতি সমেত সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। একটি "প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠী" গঠন সম্বন্ধে আলোচনার সমান্তরালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আগ্রাসী আমেরিকা-জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া ত্রিপাক্ষিক জোট প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গত দুই তিন বছরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মোতায়েন আমেরিকান ফৌজের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ। এই এলাকার মোতায়েন মার্কিন সপ্তম নৌবহরের শক্তি নিয়ত বাড়ানো হচ্ছে। এই বাহিনীতে সম্প্রতি যেসব যুদ্ধজাহাজ যুক্ত করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে

অত্যাধুনিক বিমানবাহী জাহাজ **কার্ল ভিনসন**, যুদ্ধ জাহাজ **নিউ জার্সি** (লেবাননের ভূখণ্ডে গোলাবর্ষণের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে এটি) এবং ট্রাইডেন্ট নিউক্লিয়র ক্ষেপণাস্ত্রে সজ্জিত ওহিও শ্রেণীর নিউক্লিয়র শক্তিচালিত অগ্রসর ধরনের সাবমেরিনগুলি। সপ্তম নৈবহরের জাহাজগুলিতে প্রায় ৫০০টি টোমাহক ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র—এগুলির এক-তৃতীয়াংশ নিউক্লিয়র রণফলকবাহী হবে—বসাবারও পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রকাশ্যে ঘোষিত অন্যান্য মার্কিন পরিকল্পনায় দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত ভূখণ্ডের একেবারে কাছাকাছি মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবস্থাসহ মার্কিন সামরিক শক্তি মোতায়েন করবার কথা ভাবা হচ্ছে। এর লক্ষ্য উড্ডয়নের সময় হ্রাস করা এবং একটা সফল আকস্মিক আক্রমণের সুবিধা-সম্ভাবনা বাড়ানো। সংবাদে আরও প্রকাশ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলাস্কায় এবং দূর প্রাচ্যের প্রণালীগুলির এলাকায় যথাক্রমে মাঝারি পাল্লার পের্শিং-২ ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্থলভিত্তিক ক্রূইজ ক্ষেপণাস্ত্র বসাতে চাইছে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশের উপকূলের সংলগ্ন ভারত মহাসাগরকে নিজের "একান্ত জরুরী স্বার্থের" ক্ষেত্র বলে ঘোষণা করবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ষষ্ঠ ও সপ্তম নৌবহরের বিমানবাহী জাহাজের দুটি ইউনিট স্থায়ী ভিত্তিতে মোতায়েন করেছে। দিয়েগো গার্সিয়া এখন একটি বৃহৎ দ্বীপ-ঘাঁটি যেখানে ইতিমধ্যেই নিউক্লিয়র অস্ত্রশস্ত্র বসানো হচ্ছে। এই দ্বীপে নির্মিত বিমানক্ষেত্রটিকে বর্তমানে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এবং শীগগীরই নিউক্লিয়র অস্ত্রবাহী বি-৫২ রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বোমারু বিমান এবং বিরাট মালবাহী বিমান ওঠা নামা করতে পারবে। দ্বীপটিকে এই এলাকায় দ্রুত মোতায়েনযোগ্য বাহিনীর জন্য একটি চৌকিতে পরিণত করা হয়েছে এবং এর জেটিগুলিতে সব সময় বাঁধা থাকছে মেরিন কোরের একটি ব্রিগেডের জন্য অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সাজসরঞ্জাম বহনকারী মার্কিন জাহাজগুলি। আরও প্রকাশ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপে একটি বৃহৎ নিউক্লিয়র অস্ত্রের ডিপো তৈরি করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার আওতার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিও, বিশেষ করে পাকিস্তান রয়েছে। ১৯৮১ সনে এই দেশটিকে প্রধানত তার সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্য আমেরিকা ৩২০ কোটি ডলার ক্রেডিট দিয়েছিল। এর বদলে এই দেশটিকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আক্রমণের অগ্রবর্তী এলাকায় পরিণত করার অনুমতি ও অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে, এখানে সে আরডিএফ-এর আরও একটি বাহিনী মোতায়েন করতে চাইছে। করাচী, গোয়াদার এবং পেশওয়ারে নৌ ও বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনের একটি নতুন সামরিক ঘাঁটি চালাবার জন্য বাংলাদেশের কাছ

থেকে সেন্ট-মার্টিন দ্বীপটি লীজ নিতে চাইছে। শ্রীলঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভারত মহাসাগরে মোতায়েন মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজগুলির নাবিক ও সৈনিকদের বিশ্রাম ও বিনোদনের সুবিধাসমূহের বন্দোবস্ত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

দূর প্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনশোটির বেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এর মধ্যে জাপানে রয়েছে ১২০টি ঘাঁটি—এগুলির মধ্যে প্রায় ৩০টি বৃহৎ আকারের, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০টি ও অস্ট্রেলিয়ায় ২০টির বেশি ঘাঁটি।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের দিকে আমেরিকার নজর পড়েছে। প্রায় ২,০০০ দ্বীপ ও ১৩০,০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই দ্বীপপুঞ্জটি কিছুটা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটা সেতুর মত। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ মাইক্রোনেশিয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অছিগিরির অধীন করে এবং ১৯৮১ সালের মধ্যে ঐ দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা ও স্ব-শাসনের জন্য প্রস্তুত করবার দায়িত্ব আমেরিকাকে দেয়। কিন্তু মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির একটা জালবুনুনি—যা তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ করছে—নির্মাণ করবার মধ্যেই তার "অছিগিরি" সীমাবদ্ধ ছিল।

পশ্চিমী পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পালাউ দ্বীপে ট্রাইডেন্ট ক্ষেপণাস্ত্রবাহী সাবমেরিনগুলির রক্ষণাবেক্ষন ইত্যাদির জন্য একটি নৌ ঘাঁটি নির্মাণ করেছে।

এ ছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাইপানে একটি বন্দর ও একটি সামরিক বিমানক্ষেত্র, বাবেলথুয়াপ দ্বীপে নিউক্লিয়র ও রাসায়নিক অস্ত্র গুদামজাত করবার সুবিধাদি, তিনিয়ানে একটি বিমানক্ষেত্র ও অন্যান্য সামরিক ঘাঁটি, মার্সাল দ্বীপপুঞ্জে গোলাবারুদের ডিপো ও একটি যোগাযোগ স্টেশন এবং গুয়ামে একটি নৌ-ঘাঁটি ও বি-৫২ ভারী রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বোমারু বিমানের জন্য একটি বিমানক্ষেত্র নির্মাণ করেছে।

ফিলিপাইনস-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে, ২৩টি সামরিক ঘাঁটি, এগুলির মধ্যে আছে মানিলা থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে ক্লার্কফীল্ড বিমান ঘাঁটি এবং সুবিক উপসাগর নৌ-ঘাঁটি।

৫৩০ বর্গ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ক্লার্কফীল্ড বিমান ঘাঁটিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অন্যতম বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটি। সুবিক উপসাগর নৌ-ঘাঁটিটি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় একটি বৃহৎ মার্কিন নৌবহরের চৌকি, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এই ঘাঁটি থেকে মার্কিন সপ্তম নৌবহর তৎপরতা চালাতে পেরেছিল।

১৯৭৯ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনস মার্কিন ঘাঁটিগুলির মর্যাদা

সম্বন্ধে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদন করেছিল। এই চুক্তি অনুসারে এগুলিকে বলা হবে "ফিলিপাইন" ঘাঁটি ও এগুলিকে আমেরিকার হেপাজতে রাখা হবে। কিন্তু, মূলগতভাবে এই চুক্তি পরিস্থিতি কিছুমাত্র বদলায়নি কারণ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক এগুলির ব্যবহারের উপরে কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে জানা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি ঘাঁটিতে নিউক্লিয়র অস্ত্র মজুত করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনস তাদের সামরিক সম্পর্ক-বন্ধন শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে ১৯৮২ সনের শরৎকালে একমত হয়েছিল যে তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের মধ্যে প্রতি বছর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এরকম প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৪, মার্চ মাসে। এতে যোগ দিয়েছিলেন ফিলিপাইনস-এর জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জুয়ান পোনসে এনরিলে এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাসপার ওয়েনবার্জার। বৈঠক শেষে ওয়েনবার্জার চাঁছাছোলাভাবে বলেছিলেন যে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর মার্কিন বিশ্ব রণনীতির পক্ষে একান্ত জরুরী গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ভারত মহাসাগরে সেন্টকম-এর দায়িত্বের এলাকার সঙ্গে একটা যোগসূত্র।

মোটের উপরে, প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন বিমান ও নৌ ঘাঁটিগুলির দায়িত্ব মার্কিন "একান্ত জরুরী স্বার্থের" বিপদাশঙ্কা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও দূর প্রাচ্যে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার দ্রুত স্থানান্তরণ সুনিশ্চিত করা। বর্তমান মার্কিন প্রশাসন দূর প্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলিতে তার প্রভাব সুসংহত করবার চেষ্টা করছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেণ্ট জর্জ বুশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কাসপার ওয়েনবার্জার ও ওয়াশিংটনের অন্যান্য উচ্চ স্তরের কর্মকর্তাদের এই অঞ্চলের দেশগুলিতে অসংখ্য সফর-এর সাক্ষ্য বহন করছে।

মার্কিন সামরিক কর্মনীতিতে থাইল্যাণ্ডেরও বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। ১৯৮৩ সনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যাণ্ডকে ছয় কোটি ডলার সামরিক সাহায্য দিয়েছিল এবং ১৯৮৫ সনে মার্কিন সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় দশ কোটি ডলার। থাইল্যাণ্ডকে প্রদত্ত সামরিক সাহায্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাম্পুচিয়া গণ প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত পল পট দস্যু বাহিনীগুলিকে সমর্থন যোগাবার জন্য ব্যবহার করছে।

সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত থাই বিমানক্ষেত্রগুলির উপরে নিয়ন্ত্রণ পুনরায় কায়েম করতে চাইছে। মার্কিন সপ্তম নৌবহরের জাহাজগুলি কোনরূপ বিধিনিষেধ ছাড়াই থাই বন্দরগুলিতে ভিড়বার অধিকার পেয়েছে।

১৯৮৩, ডিসেম্বর মাসে পূর্বে উল্লেখিত অ্যাডমিরাল উইলিয়ম ক্রো ব্যাঙ্ককে

অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে মার্কিন প্রশাসন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রাসায়নিক অস্ত্র ও ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করবার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।

নিজেদের ভূখণ্ড ও সংলগ্ন দরিয়া মার্কিন ঘাঁটি ও অন্যান্য সামরিক সুবিধাদি নির্মাণের জন্য খুলে দিয়ে এবং অসামরিক যুদ্ধজাহাজগুলিকে নিজেদের বন্দরে ব্যবহার করতে ও নিজেদের আঞ্চলিক দরিয়ায় যুদ্ধার্থ টহলদারি মিশন চালাতে দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলি ওয়াশিংটনের অনুকূলে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পরিহার করছে। এই প্রশ্নটি এই দেশগুলির জনসাধারণের ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। যে সব দেশে ভবিষ্যতে আগ্রাসী কাজকর্ম চালাবার উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী ঘাঁটি রয়েছে সেগুলি নির্দিষ্ট যে কোন মুহূর্তে নিজেদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী একটা সশস্ত্র নিউক্লিয়র সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। যে সব ঘাঁটিতে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাক করা নিউক্লিয়র ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বসানো হয়েছে সেগুলি এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে বিশেষভাবে গুরুতর বিপদস্বরূপ। এই সব দেশেরই একটা প্রতিশোধমূলক নিউক্লিয়র আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবার বিপদ রয়েছে।

সামরিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা ভবিষ্যৎ সংঘর্ষগুলির বীজ বপন করছে। ওয়াশিংটনের সামরিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনাগুলি নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ ও বিদ্যমান ঘাঁটিগুলির সম্প্রসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রধান উদ্দেশ্যটি হল এই অঞ্চলের দেশগুলিকে ওয়াশিংটনের কর্মধারা মেনে নিতে বাধ্য করা, সক্রিয় সহযোগিতা অর্জন করা এবং স্বাধীন বিকাশের পথে যাত্রা করেছে এমন দেশগুলির মধ্যে শত্রুতার বীজ বপন করা। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন ও জাপানী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা একটি "প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠী"—প্রশান্ত মহাসাগরে এমন একটি সংগঠন যেটি অতলান্তিকে ন্যাটো যে-ভূমিকা পালন করছে তারই অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে—স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন।

এই নতুন সামরিক জোট স্থাপনে প্রধান ভূমিকাটি দেওয়া হয়েছে জাপানকে, এই দেশটির রয়েছে অতি বিকাশপ্রাপ্ত সামরিক ও প্রাযুক্তিক নিহিত-সামর্থ্য। এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক লক্ষ্যগুলির ও এর মৌল উদ্দেশ্যের বিবরণ দিয়ে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে জাপানে মার্কিন উপস্থিতির উদ্দেশ্য মার্কিন রণনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি রক্ষা করা। এই অকপট স্বীকৃতি প্রকাশ করে দিচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইওরোপের মতই জাপানকেও একটি আমেরিকান নিউক্লিয়র জার্মান-দেশে পরিণত করবার কর্মনীতি গ্রহণ করেছে।

১৯৮৪, ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে যে যুক্ত মার্কিন-জাপানী সামরিক মহড়া শুরু

হয় তা জাপানের ভূখণ্ডের বিশাল এলাকা জুড়ে চালানো হয়েছিল। হোনসু দ্বীপে এই মহড়া চলেছিল দশ দিন ধরে। এই মহড়ায় অংশ নিয়েছিল আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা মার্কিন সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলি, ফিলিপাইনস-এ মোতায়েন এফ-৪ জঙ্গী বিমানগুলির একটি স্কোয়াড্রন এবং অন্যান্য অসংখ্য ধরনের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম। আকাশ ও সমুদ্রস্থিত লক্ষ্যবস্তুগুলিকে আঘাত করবার ব্যাপারে পাইলটদের প্রশিক্ষণ দেবার উদ্দেশ্যে ওকিনাওয়ায় বিমান মহড়া চালানো হয়েছিল।

মার্কিন-দক্ষিণ কোরীয় সামরিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক সামরিক সহযোগিতা সম্পর্কিত ১৯৫৩ সনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ঐ চুক্তি অনুসারে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে তার সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াবার জন্য—বর্তমানে এই সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৬০১,০০০—সাহায্য দিয়েছিল, সেনাবাহিনীকে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছিল এবং ঐ দেশে ৪২,০০০ মার্কিন ফৌজ মোতায়েন করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় এক হাজার স্বল্পতর পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্রও রেখেছিল। আজকে দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর ৩০ টি বিমানক্ষেত্র ও প্রায় ২০০টি অন্যবিধ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

১৯৮১, ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওয়াশিংটনে রোনাল্ড রেগন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেণ্ট চুন দু-হুয়ানের মধ্যে বৈঠকে মার্কিন-দক্ষিণ কোরীয় সামরিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা হয়। ঐ সভায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট বলেছিলেন যে মার্কিন পক্ষ দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যসংখ্যার কোনরূপ হ্রাস বা সেখান থেকে মার্কিন ফৌজ প্রত্যাহার বাতিল করে দিচ্ছে।

সেই ১৯৮১ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকার করেছিল যে "আপৎকালীন-পরিস্থিতিতে" সে দক্ষিণ কোরিয়ার হাতে অবিলম্বে সে দেশে মজুত রাখা ২০০ কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন সামরিক সাজসরঞ্জাম তুলে দেবে, অগ্রসর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করবে এবং সামরিক সাহায্য বাড়াবে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে মোট ৯০ কোটি ডলারে ৩৬টি সর্বাধুনিক মার্কিন জঙ্গী বোমারু বিমান বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একমাত্র ১৯৮২ সনেই দক্ষিণ কোরিয়াকে মার্কিন সামরিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ডলার, এবং ১৯৮৩, ৬-৮ ফেব্রুয়ারি সিউল সফরকারী মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ শুলজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই সাহায্য আরও বাড়ানো হবে। ১৯৮৩, ৩ মে তারিখে **ওয়াশিংটন পোস্ট** সংবাদ দিয়েছিল যে রেগন প্রশাসন দক্ষিণ কোরিয়ায় ল্যান্স ক্ষেপণাস্ত্র এবং মার্কিন ও দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্যদের দ্বারা ব্যবহৃত ২০৩ মিলিমিটার হাউইটজারের জন্য নিউট্রন কামানের গোলাসহ নিউট্রন অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করবার পরিকল্পনা করছে।

বার্ষিক ভিত্তিতে পরিচালিত "টীম স্পিরিট" এই সাংকেতিক নামের যুক্ত সামরিক মহড়ার পরিসর প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা দুটি মিত্র দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতার এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। উদাহরণস্বরূপ, টীম স্পিরিট -৮২ সামরিক মহড়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার এক লক্ষ ও আমেরিকার ৬২ হাজার সৈন্য অংশ নিয়েছিল। ১৯৮৩ সনের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত গোটা দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে পরিচালিত টীম স্পিরিট-৮৩ পরিসরের দিক থেকে এমন কি আরও বৃহৎ ছিল। মার্কিন পত্রপত্রিকার প্রতিবেদনে জানা যায়, মার্কিন ষষ্ঠ আর্মির ইউনিটগুলি, প্রথম আর্মিকোয়ের সেনানীমণ্ডলী, সপ্তম পদাতিক ডিভিশন এবং আরডিএফ-এর অংশ ৮২তম বিমানবাহিত ডিভিশনকে এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল।

নবম মার্কিন-দক্ষিণ কোরীয় যুক্ত সামরিক মহড়া টীম স্পিরিট-৮৪, ১৯৮৪ সনের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় স্থায়ীভাবে মোতায়েন ৪০,০০০ সৈন্যের মার্কিন বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩৬,৪০০ আমেরিকান সৈন্যকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই উস্কানিমূলক যুদ্ধ মহড়ায় মোট ২০৭,০০০-এর বেশি অফিসার ও সৈন্য, বিপুল পরিমাণ সামরিক সাজসরঞ্জাম, জঙ্গী বিমান ও নৌবহরকে ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং সৈন্য ও সামরিক সাজসরঞ্জামের কিছু অংশ আমেরিকা থেকে জাপানী ভূখণ্ডে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলি দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

এইসব মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল যুক্ত মার্কিন-দক্ষিণ কোরীয় বৃহদাকার আক্রমণাভিযান ও বিশাল এলাকা জুড়ে উভচর সমর তৎপরতা এবং সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ ইউনিটগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মহড়া দেওয়া।

ইতিমধ্যেই উপরে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোটি কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তান পাবে অতি অগ্রসর ধরনের আকাশ-থেকে-আকাশে নিক্ষেপযোগ্য স্প্যারো ক্ষেপণাস্ত্র, এর আগে পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে এফ-১৬ জঙ্গী বিমান কিনেছিল সেগুলিতে এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি বসানো হবে। এ ছাড়া, পাকিস্তান পাচ্ছে সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার, সমুদ্র-ভিত্তিক হারপুন ক্ষেপণাস্ত্র যে গুলি পাকিস্তানী যুদ্ধ জাহাজগুলিতে বসানো হবে।

এইসব আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানের কেন দরকার ?

আমেরিকার সহায়তায় পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বাড়াবার পেছনে প্রধান কারণটি দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে ওয়াশিংটনের রণনৈতিক পরিকল্পনায় পাকিস্তানকে যে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। পাকিস্তানকে অতি অগ্রসর ধরনের রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্রাদির নিবিড় ও

অবিচল সরবরাহ ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করবার জন্য অভিযান পরিচালনাকারী জাতিগুলির প্রতি এক স্থূল চ্যালেঞ্জ, এবং তা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন ও এশিয়ায় শান্তি এই উভয়কে বিপন্ন করছে।

ওয়াশিংটনের রণনৈতিক পরিকল্পনায় "অ-নিমজ্জনশীল বিমানবাহী জাহাজ" তাইওয়ানকে এক বিশিষ্ট ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এর ভৌগোলিক অবস্থান এশিয়া মহাদেশের বাকী অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থাপনকারী সমুদ্রপথগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করে তুলছে।

দীর্ঘকাল ধরে মার্কিন-তাইওয়ান সামরিক-রাজনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি ১৯৫৪ সনের পারস্পারিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। এই চুক্তি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে তার সশস্ত্র বাহিনী বর্তমানে এর সৈন্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ—শক্তি বাড়ানোর জন্য বিশাল সাহায্য দান করেছিল এবং এই বাহিনীকে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছিল। ১৯৭৯ সনে, প্রেসিডেণ্ট কার্টার ১৯৫৪ সনের চুক্তি রদ করেছিলেন কিন্তু সেই বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আইন পাশ করে "তাইওয়ানের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি" সুনিশ্চিত করবার অঙ্গীকার করে। এর পরে মার্কিন-তাইওয়ান সম্পর্ক প্রধানত তাইওয়ানকে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয়ের মধ্যে সীমিত থেকেছে।

পেণ্টাগণ তার সামরিক রণনীতিতে আসিয়ান সদস্য-রাষ্ট্রগুলিকেও জড়িত করতে চাইছে। আসিয়ান দেশগুলির উপরে তার সর্বাধুনিক অস্ত্র-ব্যবস্থাদি জোর করে চাপিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটন আশা করছে এই আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংগঠনটিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় একটি সামরিক জোটে পরিণত করতে। উদাহরণস্বরূপ, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড ও মালয়শিয়ায় অস্ত্র যোগানের মধ্যে রয়েছে এফ-১৬ জঙ্গী-বোমারু বিমান ও অন্যান্য অস্ত্র-ব্যবস্থা তথা বিশেষ করে সিঙ্গাপুরের জন্য আওয়াকস বিমান, যদিও একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে এশিয়ার এই ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রটির এরকম অত্যাধুনিক বিমান সত্যিই দরকার।

ফিলিপাইনস-এর **বুলেটিন টুডে** সংবাদ পত্রের মতে, আসিয়ান দেশগুলিকে আগামী দশ বছরে সর্বমোট এক হাজার কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহ করা হবে যেখানে গত পাঁচ বছরে তিনশো কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র যোগানো হয়েছিল।

উপরে উদ্ধৃত অঙ্কগুলি থেকে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না যে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে ওয়াশিংটনের কর্মনীতির উদ্দেশ্য এই অঞ্চলে আমেরিকান সামরিক উপস্থিতির শক্তি বাড়ানো। এশিয়ার একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা মেনে নিতে বাধ্য করা এবং সোভিয়েত-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী সামরিক জোট প্রতিষ্ঠা করা। কথান্তরে, মার্কিন কর্মনীতির

লক্ষ্য হল এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এশিয়ায় সামরিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির করে তোলা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এশিয়ায় তার সামরিক উপস্থিতির শক্তি বাড়াচ্ছে এবং সেখানে বিরাট সংখ্যায় গণবিধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েন করছে এই ঘটনাটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কেন এশিয়ায় ও পৃথিবী জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত কর্মনীতি সর্বসাধারণের উৎকণ্ঠা না জাগিয়ে পারে না।

* * *

এশিয়ায় ওয়াশিংটন কর্তৃক অনুসৃত কর্মনীতি সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপজ্জনক সমরবাদী কর্মনীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছে বিভিন্ন সরকার, গণসংগঠন ও আন্দোলন এবং রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘের আলোচ্য সূচীতে এমন বহু বিষয় রয়েছে যেগুলি এই গ্রহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জাতিগুলির সত্যিকারের উৎকণ্ঠাকে প্রতিবিম্বিত করছে। কাজেই খুব স্বাভাবিক কারণেই ১৯৮১ সনে নিউক্লিয়র বিপর্যয় নিবারণ সম্পর্কিত ঘোষণা গৃহীত হবার পর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৮-তম অধিবেশনে "নিউক্লিয়র যুদ্ধের নিন্দা" শীর্ষক ঘোষণাটি গ্রহণ করেছিল।

১৯৮৪ সনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৯-তম অধিবেশনে অস্ত্র-শস্ত্র, বিশেষ করে নিউক্লিয়র অস্ত্র, সীমিত ও হ্রাস করবার লক্ষ্যে ৬০টির বেশি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই অধিবেশনে নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রথম ব্যবহার করবার বাধ্যবাধকতা—একটি আন্তর্জাতিক আইনী দলিলে এই বাধ্যবাধকতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া উচিত—গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের কাছে পুনরায় আবেদন করেছিল। নিউক্লিয়র অস্ত্রধর শক্তিগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণকারী কিছু কিছু মানদণ্ড স্থাপন করবার যে চিন্তাধারা সোভিয়েত ইউনিয়ন উপস্থাপন করেছিল সেটিকে স্বাগত জানিয়ে কয়েকটি প্রস্তাবে এই ভাবধারাকে বাস্তববোধ ও দায়িত্ববোধের একটি সাক্ষ্য বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

এইসব প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘ সদস্য-রাষ্ট্রগুলি বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের দ্বারা পাশ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার কতিপয় মিত্র দেশ ২৬টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল এবং আরও ১০টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মাত্র একটি ভোট পড়েছিল, সেটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

বহির্মহাকাশের সামরিকীকরণ নিবারণ করবার জন্য সোভিয়েত প্রস্তাবটি বিশেষ সোৎসাহ সাড়া পেয়েছিল। ঐ প্রস্তাবের মৌল জোরটি ছিল শুধুমাত্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই বহির্মহাকাশকে ব্যবহার করবার উপরে, এই জোরটির অভিব্যক্তি ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে রাষ্ট্রসংঘের বলতে গেলে সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত একটি প্রস্তাবের মধ্যে।

মোটের উপরে, এই অধিবেশন দেখিয়ে দিয়েছিল যে শান্তি ও সহযোগিতার নীতির প্রতি রাষ্ট্রসংঘ সদস্য-রাষ্ট্রগুলি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিল।

৪০ বছর আগে এশিয়ায় একটি ঘটনার মধ্যে নিউক্লিয়র-বিরোধী আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছিল ; ঘটনাটি ছিল ১৯৪৫ সনে হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপরে বর্বরোচিত বোমাবর্ষণ। পরমাণু বোমাবর্ষণের পরিণতিতে বিচলিত জাপানী জনগণ গোটা বিশ্বের নজরে এই পরিণতিকে তুলে ধরবার জন্য বিরাট প্রয়াস চালিয়েছিলেন। জাপানের নিউক্লিয়র-বিরোধী আন্দোলনের কর্মীদের কাজের দরুনই প্রধানত পৃথিবীর বহু দেশে অসংখ্য নিউক্লিয়র-বিরোধী গোষ্ঠী স্থাপিত হয়েছিল।

এশিয়ার দেশগুলি সহ অনেক দেশের সরকার নিউক্লিয়র-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির লক্ষ্যের অংশভাক্ এবং এদের কার্যকলাপকে সমর্থন করে। আজকের দিনের বাস্তবতার ইঙ্গিতবাহী হল এই মর্মে ক্রমবর্ধমান চেতনা যে নিউক্লিয়র যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্প্রতি যুক্ত উন্নয়শীল ও জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপদশঙ্কা সৃষ্টি করছে। এই চেতনা পুনরায় ব্যক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৯-তম অধিবেশনে, এই অধিবেশন চলাকালে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি সহ অধিকাংশ জোট-নিরপেক্ষ দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চাপ সত্ত্বেও নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও উপনিবেশবাদ-বিরোধী অবস্থান বজায় রেখেছিল। তারা শুধুমাত্র যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক উত্থাপিত মৌল প্রস্তাবগুলি সমর্থন করেছিল তা নয়, পরন্তু নিজেরাও গুরুত্বপূর্ণ সব উদ্দেশ্য উপস্থাপন করেছিল। এইসব উদ্যোগ দেখায় যে সমাজতান্ত্রিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির অতি জরুরী স্বার্থগুলি মিলে যাচ্ছে যেগুলি তারা নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদাশঙ্কা দূর করার এবং শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতিগুলির অধিকারসমূহ রক্ষা করায় সমানভাবে আগ্রহী। অতএব জীবনের সত্যই সমাজতান্ত্রিক পরিবারের ও পশ্চিমের দেশগুলি থেকে জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির সমদূরত্বের তত্ত্বটিকে পুনরায় খণ্ডন করছে।

নিউক্লিয়র অস্ত্র বহনকারী ও অন্যান্য দেশের সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি মোতায়েন মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলি এইসব দেশের নিরাপত্তার পক্ষে কীরূপ বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করছে সে সম্বন্ধে বলবার কোন প্রয়োজন প্রায় নেই। পৃথিবী জুড়ে জাতিসমূহ এই বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে ক্রমেই বেশি বেশি অবহিত হচ্ছে। অধিকন্তু, এমনকি ওয়াশিংটনের সরকারী মুখপাত্রগণ ও পেণ্টাগণের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ একাধিকবার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে এশিয়ায় আমেরিকান মিত্রগণ সহ বহু দেশ মার্কিন নৌ উপস্থিতির বিরোধিতা করেছে।

এই ধরনের "প্রতিবন্ধকতার" একটা "প্রমাণ" প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন এখন

আমেরিকার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের বন্দরগুলি ও আঞ্চলিক দরিয়ায় নিউক্লিয়র অস্ত্রবাহী জাহাজগুলিকে প্রবেশ করতে না দিতে নিউজিল্যাণ্ডের সদ্য-গঠিত লেবর সরকারের সিদ্ধান্তে ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া ছিল খোলাখুলি এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের হুমকি। ওয়াশিংটন বিশেষ করে এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে এই অঞ্চলের অন্য যেসব দেশে নিউক্লিয়র-বিরোধী আন্দোলন ভরবেগ অর্জন করছে তারাও হয়ত নিউজিল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে।

এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আকারে নিউক্লিয়র অস্ত্র মোতায়েনের বিপদ সম্বন্ধে জাপানে ক্রমবর্ধমান চেতনা জাপানী শান্তি আন্দোলনকে নতুন প্রণোদন যুগিয়েছিল। এই আন্দোলন নিউক্লিয়র বিপদাশঙ্কার বিরুদ্ধতা করছে এবং আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সামরিক জোট-বন্ধন বাতিল করবার দাবি করে। ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী নতুন নতুন সংগঠন গঠিত হয়েছিল এবং নিউক্লিয়র অস্ত্রবাহী আমেরিকান জাহাজগুলির জাপানী বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হোক এই দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত করা হয়েছিল। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন ভরবেগ অর্জন করছে।

নিউক্লিয়র আয়ুধশালাগুলির শক্তি বাড়াবার মার্কিন নীতির ফলে গোটা গ্রহ যে বিপদাশঙ্কার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে চেতনা বাড়ানোয় পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা এক গুরুত্বপূর্ণ দান রাখছেন। এই আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন সেইসব চিকিৎসকরা যাঁরা তাঁদের সম্মেলনের দলিলগুলিতে ও বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাগুলিতে নিউক্লিয়র অস্ত্র কখনো ব্যবহৃত হলে তার অনিবার্য ফল-পরিণামগুলি বিবৃত করছেন।

চিকিৎসকরা যেসব সিদ্ধান্ত টেনেছেন সেগুলি খণ্ডন করবার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু রাজনীতিবিদ ও রণনীতি বিশারদ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, দাবি করেছেন যে "সীমিত" নিউক্লিয়র যুদ্ধ সম্ভব এবং নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ থেকে পৃথিবীর কিছু কিছু এলাকা অক্ষত থেকে যাবে। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে পৃথিবীতে বা এশিয়ায় বাস্তবে এধরনের কোন এলাকাই থাকবে না।

বিজ্ঞানীদের উৎকণ্ঠা ও দায়িত্ব

বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, নিউক্লিয়র অস্ত্রশস্ত্র মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে যে বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করেছে তার প্রতি পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য জোরদার প্রয়াস প্রয়োজন। চিকিৎসকরা যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছিলেন তা নিউক্লিয়র অস্ত্রের বিপুল ধ্বংসাত্মক নিহিত শক্তি সম্বন্ধে এবং এই অস্ত্রের ব্যবহারের যে বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটতে পারে তার সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্ম দিয়েছিল।

নিউক্লিয়র অস্ত্রের সম্ভাব্য ব্যবহারের ফল-পরিণাম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য গত ৪০ বছর ধরে যে-প্রয়াস চালানো হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে পুনরায় আলোচনা করা যাক।

১৯৪৫, আগস্ট মাসে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমাবর্ষণের পর অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা জনসাধারণের উপরে এবং কিছুটা পরিমাণে, পরিবেশের উপরে বিস্ফোরণের ফলাফল সম্বন্ধে সমীক্ষা চালান নানা হিসাব মতে, বিস্ফোরণ ও বিস্ফোরণজনিত চাপের ফলে একমাত্র প্রথম দিনই হিরোসিমায় ৪৫ হাজার ব্যক্তি মারা যায়। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে মোট ২৭৩,০০০ জন ব্যক্তি মারা গিয়েছিল এবং ১৯৫,০০০ জন বিকীরণজনিত ব্যাধিতে ভুগেছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে পরমাণু বোমাবর্ষণের শিকারদের সংখ্যা লিউকেমিয়া ও বিকীরণজনিত অন্যান্য ব্যাধির দরুণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই বিরাট সংখ্যক মৃত্যুর তুলনায় পরিবেশের ক্ষতি হয়ত সামান্য বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এমনকি সেই সময়েও বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে হিরোসিমা এবং নাগাসাকি অগ্নিঝড়ের দ্বারাও আক্রান্ত হয়েছিল এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থসমন্বিত "কৃষ্ণ বৃষ্টিপাত" হয়েছিল। ঝঞ্ঝাবাত্যা দ্বারা তাড়িত হয়ে এইসব পদার্থ বিস্ফোরণ স্থল থেকে অনেক দূরে পর্যন্ত পতিত হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকের শেষে ও ষাটের দশকের গোড়ায় যে আবহমণ্ডলে পারমাণবিক ও তাপ নিউক্লিয়র পরীক্ষা চালানো হয় তা নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফল-পরিমাণ সম্বন্ধে গবেষণাকে পুনরায় ক্রিয়াশীল করে তোলে ; এই গবেষণা আবহমণ্ডলের উপরে এইসব বিস্ফোরণের সম্ভাব্য ফলাফল সম্বন্ধে সমীক্ষা চালানোর উপরে, কারণ পরীক্ষার সময় বিস্ফোরিত সমস্ত বোমার মোট বিস্ফোরণ-শক্তি হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমাগুলি ফেলা হয়েছিল সেগুলির বিস্ফোরণ-শক্তির চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি ছিল।

ষাটের দশকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ হয়ত ওজোন স্তর কমিয়ে দিতে পারে। ওজোন স্তরের উপরে আবহমণ্ডলে নিউক্লিয়র পরীক্ষার সম্ভাব্য ফলাফল চিহ্নিত করাটা একটা জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়া বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। মাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ষাটের দশকের গোড়ায় সংগৃহীত পর্যবেক্ষণ তথ্যাদি প্রক্রিয়নের জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ পদ্ধতিগুলি ওজোন উপাদান দুই থেকে তিন শতাংশ হ্রাস পাওয়ার ঘটনাটি প্রমাণ করা সম্ভব করে তুলেছে— এই অঙ্কটি তত্ত্বগত মূল্যায়ণের কাছাকাছি। আবহমণ্ডলে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ বাতাসকে উত্তপ্ত করে ২০০০ সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়, যে-তাপে সাধারণত সক্রিয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, নাইট্রিক অক্সাইডের জন্ম দেয়। একটি দশ লক্ষ টন টিএনটি-র সমান নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ ৫০০০ টন নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে যা আবহমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে যা পরপর বিক্রিয়ায় হাজার হাজার ওজোন অণু ধ্বংস করে দিতে পারে। অনুমান করা হয়েছে যে বর্তমানে নিউক্লিয়র অস্ত্রের যে-মজুত রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করা হলে গোটা ওজোন স্তরের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ওজোন স্তর হ্রাস পেলে তার ফলে অতি-বেগুনি বিকীরণ বাড়তে পারে যা আবার ত্বকের ক্যান্সার রোগ, সৌর অন্ধত্বের অধিকতর প্রকোপ ঘটাতে পারে এবং ফসলের ফলন কমিয়ে দিতে পারে। সর্বাত্মক নিউক্লিয়র সংঘর্ষের ফলে ওজোন স্তরের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ হ্রাস পেলে তা ভূপৃষ্ঠে প্রবেশকারী অতি-বেগুনি বিকীরণের তীব্রতা বাড়িয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছে দেবে যা মানুষ ও পশুকে হত্যা করতে এবং অধিকাংশ নিম্নতর প্রজাতির জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে বংশগত পরিবর্তনসমূহ নিয়ে আসতে পারে।

সত্তরের দশকে বৃহৎ বিস্ফোরণ শক্তিসম্পন্ন নিউক্লিয়র অস্ত্র ফাটানো হলে তার ফলে বড় শহরগুলিতে হতাহতের সংখ্যা ও সম্ভাব্য ধ্বংসলীলার স্তর নিরূপণ করবার উপরে গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিউক্লিয়র অস্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের বিশদ সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে হিরোসিমা ধ্বংসকারী বোমাটির অনুরূপ একটি বোমা নিউইয়র্কের উপরে কাজের সময়, অর্থাৎ যখন এই নগরে মানুষের বৃহত্তম কেন্দ্রীকরণ ঘটে সেই সময়, বিস্ফোরিত হলে তৎক্ষণাৎ হতাহতের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশি দাঁড়াবে। একই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, একটি এক মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ ২৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাযুক্ত একটি নগরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেবে। **নিউক্লিয়র যুদ্ধ : চিকিৎসাবিদ্যাগত ও জীববিদ্যাগত ফল-পরিণাম। সোভিয়েত চিকিৎসকদের অভিমত** নামক বইয়ে অন্তর্ভুক্ত সোভিয়েত চিকিৎসকদের হিসাব অনুসারে দশ লক্ষ অধিবাসীর একটি শহরের উপরে একটি এক মেগাটন বোমা বিস্ফোরিত হলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর সংখ্যা তিন লক্ষের বেশি

হবে, আহতের সংখ্যা হবে দুই লক্ষ এবং সমসংখ্যক ব্যক্তি পোড়া ও অন্যান্য আঘাত পাবে। এ ছাড়া, শহরের কেন্দ্রস্থলে ব্যবসা বাণিজ্যের এলাকায় হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলি হওয়ায় শতকরা ৮০ জন চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরাও মারা যাবে। যেসব চিকিৎসক বেঁচে থাকবে তারা যাদের দরকার হতে পারে তাদের সকলকে চিকিৎসা করতে পারবে না। নিউক্লিয়র যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসকবৃন্দ নামে সংগঠনের যুগ্ম-সভাপতি অধ্যাপক বার্নার্ড লোন একবার বলেছিলেন—নিউক্লিয়র যুদ্ধ বেঁধে গেলে যারা বেঁচে থাকবে বস্তুত তাদের প্রতীক হিসাবেও কোন কিছু দেবার থাকবে না আধুনিক ঔষধপত্রের।

একটা বড় শহরের উপরে ব্যবহার করা হলে, একটি এক মেগাটন বোমার বদলে অনেকগুলি স্বল্প বিস্ফোরণ শক্তি যুক্ত নিউক্লিয়র বোমার ফলাফল এমনকি অধিকতর বিপর্যয়কর হতে পারে। উপরে উল্লেখিত রাষ্ট্রসংঘের সমীক্ষায় বলা হয়েছিল মোট ০'৪ মেগাটন বিস্ফোরণ-শক্তিযুক্ত দশটি ৪০ কিলোটন বোমা একটি অপরটি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে দূরে বিস্ফোরিত হলে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি ঘটাবে, বিশেষ করে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যার বিচারে।

নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আলোচনা চক্র ও সভায় অনেক দেশের চিকিৎসকরা বিপুল ধ্বংসলীলা, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, শিল্প ও কৃষিতে বিশৃংখলা, অধিকাংশ খাদ্য সরবরাহের বিশাল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়া তথা নিউক্লিয়র যুদ্ধের অন্যান্য বিপর্যয়কর ফলাফল সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করেছিলেন।

বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমাবেশের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

প্রধান প্রধান সোভিয়েত ও আমেরিকান চিকিৎসকদের উদ্যোগে নিউক্লিয়র যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসকবৃন্দের প্রথম কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সনে ভার্জিনিয়ার এয়ারলিতে, এতে যোগ দিয়েছিলেন ১১টি দেশের প্রতিনিধিরা। ইংলণ্ডের ক্যাম্ব্রিজে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯৮২) যোগ দিয়েছিলেন ৩২টি দেশের চিকিৎসকরা, আমস্টার্ডামে তৃতীয় কংগ্রেসে (১৯৮৩) ৪৩টি দেশের চিকিৎসকরা এবং হেলসিংকিতে চতুর্থ কংগ্রেসে (১৯৮৪) ৫০টির বেশি দেশের চিকিৎকরা।

১৯৮২ সনে রোমে অনুষ্ঠিত হয় ৩৬টি জাতীয় বিজ্ঞান অকাদমির প্রতিনিধিদের এক সভায়, এতে নিউক্লিয়র নিরস্ত্রীকরণের সমস্যাদি নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছিল। নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহারের নিন্দা করে একটি ঘোষণা সভায় গৃহীত হয়।

পাগওয়াস সম্মেলনের ওয়ারশ অধিবেশনে নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে

গৃহীত একটি ঘোষণায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ১১১ জন বিজ্ঞানী স্বাক্ষর দান করেছিলেন। এই ঘোষণায় নিউক্লিয়র যুদ্ধ নিবারণের দিকে নিয়ে যাবে এমন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল।

সুইডেন আম্বিও। **মানব পরিবেশের পত্রিকা-র** একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। এতে সংকলিত হয়েছিল নিউক্লিয়র যুদ্ধের সম্ভাব্য আবহমণ্ডলগত, পরিবেশগত, চিকিৎসাগত ও অর্থনৈতিক ফল-পরিণাম সম্বন্ধে প্রবন্ধসমূহ। প্রবন্ধ-গুলি লিখেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের বিজ্ঞানীরা।

১৯৮৩ সনে মস্কোতে অনুষ্ঠিত হয় মানবজাতিকে নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য, নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির জন্য কর্মরত বিজ্ঞানীদের একটি জাতীয় সম্মেলন। এতে অংশ নিয়েছিলেন ২০টি দেশ থেকে পাঁচ শতাধিক বিজ্ঞানী। তাঁরা যেসব নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন সেগুলি **সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদমির বুলেটিন**-এর একটা বিশেষ সংখ্যায়। এই সম্মেলনে শান্তির জন্য নিউক্লিয়র বিপদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কমিটি স্থাপিত হয়। এর সভাপতি নির্বাচিত হন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান অকাদমির উপ-সভাপতি ইয়েভগেনি ভেলিখোভ।

ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয় "নিউক্লিয়র যুদ্ধের পর পৃথিবী সম্পর্কিত সম্মেলন"। এই সম্মেলন চলাকালে বিশিষ্ট সোভিয়েত ও আমেরিকার মধ্যে উপগ্রহের মাধ্যমে আলোচনার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

সেনেটার এডওয়ার্ড কেনেডী ও সেনেটার মার্ক হ্যাটফীল্ড কর্তৃক আমেরিকান কংগ্রেসে আয়োজিত একটি আলোচনা চক্রে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিশ্বজোড়া ফল-পরিণাম সম্বন্ধে তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেছিলেন।

বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত গবেষণা দেখাচ্ছে যে নিউক্লিয়র অস্ত্রশস্ত্রের বিকাশ এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যখন এগুলির ব্যবহার পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে এযাবৎ জ্ঞাত অতীতের সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত পরিবর্তনগুলির চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে তাৎক্ষণিত বিনষ্টি ও কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ছাড়াও, বিশাল বিশাল ভূখণ্ডের তেজষ্ক্রিয় সংক্রমন, স্ট্রাটোস্ফীয়ারে রক্ষণকারী ওজোন স্তরের হ্রাস, অগ্নিঝড়, নগর ও অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড—এসবই নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফল—আবহমণ্ডল ও স্থল-ভাগের আলোক সংক্রান্ত ধর্ম ও তাপমাত্রা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে।

"নিউক্লিয়র শীতকালের" সম্ভাব্য প্রভাব ও ফলাফল সম্বন্ধে এবারে আমরা বিচার বিবেচনা করব।

"নিউক্লিয়র শীতকাল" কী?

১৯৮৩ সনে, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও রিপোর্টারদের মধ্যে চালু হয় নতুন, পূর্বে অব্যবহৃত একটি কথা, "নিউক্লিয়র শীতকাল"। কথাটির একেবারে যথার্থ অর্থে একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ কিংবা সাংবাদিকদের দ্বারা বানানো একটি শব্দসমষ্টি না হলেও এ এমন একটা সতর্কবার্তা জ্ঞাপন করছে বিজ্ঞানীরা বিশ্ব জনমত ও পৃথিবীর সকল মানুষের উদ্দেশে যে-সতর্কবার্তা উচ্চারণ করছেন। পৃথিবী যদি কখনো নিউক্লিয়র উন্মত্ততাকে ঘটতে দেয় তাহলে এই গ্রহের দূরতম এলাকাগুলির জনগণ সহ গোটা মানবজাতির জন্য অপেক্ষা করছে "নিউক্লিয়র শীতকাল"।

স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বাভাবিক অবস্থায় সৌর বিকীরণের শক্তিকে আত্মভূত করে ভূপৃষ্ঠ, সাগর মহাসাগর ও আংশিকভাবে আবহমণ্ডল, বছরের কাল ও অক্ষাংশ অনুসারে এ তিনটিই অসমভাবে উত্তপ্ত হয়। তাপমাত্রার এই পার্থক্য আবহমণ্ডল ও সাগর মহাসাগরের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটায় এবং এমন একটা জলবায়ু সৃষ্টি করে যার সঙ্গে পরিবেশ আর মানুষ দুটি নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে—কয়েক দশক পর পর কিংবা আরও কম ঘন ঘন—প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট জলবায়ুগত পরিবর্তসমূহ সংঘটিত হয়।

বিশ্ব নিউক্লিয়র সংঘর্ষ সহ বিশ্বজোড়া বিপর্যয়সমূহ সম্বন্ধে অধ্যায়ন করতে হলে সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম বিকল্প ঘটনা-বিকাশসমূহ এবং সবচেয়ে কম সম্ভাব্য সহ আঞ্চলিক ও বিশ্ব জোড়া ফল-পরিমাণ ও এর অভিঘাত পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এরূপ বিশ্বজোড়া বিপর্যয়সমূহের সঙ্গী হিসেবে আবহমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে জলবায়ুগত পরিবর্তনসমূহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট উপাদানগুলির দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে ঘটতে পারে।

বিদ্যমান নিউক্লিয়র মজুতের মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ ব্যবহার করা হলে তা দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের মত বিশাল এলাকায় দাবানল সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া, আগুন গ্রাস করবে গোটা এক-একটি নগর, শিল্পকেন্দ্র এবং গ্যাস ও তেল ক্ষেত্রগুলিকে। নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ আবহমণ্ডলে বিপুল পরিমাণে ধূলি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কণা পাঠাবে। ধোঁয়া, ধূলি ও জল আবহমণ্ডলকে এমন দূষিত করবে যে তা ভূপৃষ্ঠে আগত সূর্যকিরণের তীব্রতা কয়েক ভাগ কমিয়ে দেবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে এক "নিউক্লিয়র রাত্রি", এই ব্যাপারটার বর্ণনা প্রথমে দিয়েছিলেন ম্যাক্স প্লাঙক রসায়ন ইন্সটিটুটের (পশ্চিম জার্মানি) পল ক্রুটজেন

এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) জন বার্কস "নিউক্লিয়র যুদ্ধের পর আবহমণ্ডল ঃ মধ্যাহ্নে গোধূলি" শীর্ষক প্রবন্ধে। মার্কিন বন বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি ব্যবহার করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে দশ লক্ষ বর্গমিটার এলাকায় দাবানল আবহমণ্ডলে ২০ কোটি টন পর্যন্ত ধোঁয়া ও ঝুল ঠেলে পাঠাবে, এই পরিমাণটা গোটা উত্তর গোলার্ধের উপরে ধোঁয়ার এমন একটা স্তর সৃষ্টি করবার পক্ষে পর্যাপ্ত যে-স্তরটি সূর্যকিরণের তীব্রতা বেশ কয়েকভাগ কমিয়ে দেবে।

দাবানলের পাশাপাশি, নগরগুলিতে এবং গ্যাস ও তেল ক্ষেত্রগুলিতে অগ্নিকাণ্ড "নিউক্লিয়র রাত্রি" ব্যাপারটার সৃষ্টিতে, আরও বেশি না হলেও, সমান সহায়ক হতে পারে। বড় বড় শহরে মজুত করা দাহ্য পদার্থসমূহের অনুপাত প্রতি বর্গমিটারে কয়েকশো কিলোগ্রাম। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩, ২৭-২৮ জুলাই তারিখে হামবুর্গ শহরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে-পরিমাণ জ্বালানি পুড়েছিল তার অনুপাত ছিল প্রতি বর্গমিটারে ৩০০ কিলোগ্রাম। অধিকন্তু, একথা মনে রাখতেই হবে যে তেল, পালিমার ও অন্যান্য তেলজাত সামগ্রী পুড়বার ফলে যেসব কণার জন্ম হয় সেগুলি দাবানল-সৃষ্ট ধোঁয়ার চেয়ে অধিকতর পরিমাণে সূর্যালোককে আত্মভূত করে।

তাঁদের আগেকার সমীক্ষাগুলির ফলাফলের আলোকে সোভিয়েত ও মার্কিন জলবায়ু তত্ত্ববিদগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে "নিউক্লিয়র রাত্রি", অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে সূর্যকিরণের তীব্রতার প্রচণ্ড হ্রাস গোটা গ্রহ জুড়ে আচমকা আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাবে। "নিউক্লিয়র রাত্রির" প্রধান জলবায়ুগত ফল হবে "নিউক্লিয়র শীতকালের" আবির্ভাব, অর্থাৎ পৃথিবীর স্থলভাগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শীতল হয়ে যাবে। "নিউক্লিয়র রাত্রির" অনিবার্য ফল যে "নিউক্লিয়র শীতকাল" হবে যা ১৯৮৩ সনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন ঐ ব্যাপারটির মৌল গাণিতিক মডেলটি উদ্ভাবন করা হয়। একদল আমেরিকান বিজ্ঞানী কর্তৃক রচিত একটি নিবন্ধে এরূপ প্রথম মডেলটি উপস্থিত করা হয়েছিল। "নিউক্লিয়র শীতকালের" অবস্থায় পৃথিবীর স্থলভাগের সম্ভাব্য শীতল হয়ে যাওয়ার হিসাবটির ভিত্তি হিসাবে নিয়েছিলেন পৃথিবীর উপরে একটি গ্রহাণু পতিত হওয়ার সময় ৬·৫ কোটি বছর আগে যে জলবায়ুগত বিপর্যয় ঘটেছিল সেটি অধ্যয়ন করবার জন্য উদ্ভাবিত মডেলটিকে। তাঁদের হিসাব অনুসারে, একটা নিউক্লিয়র যুদ্ধের পরে আবহমণ্ডলের উপরের স্তরে অধিকতর পরিমাণে ধূলির অংশ ও নীচের স্তরে অধিকতর পরিমাণে ধোঁয়ার অংশ কয়েক মাসের মধ্যেই পৃথিবীর স্থলভাগে তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৫০ ডিগ্রি হ্রাস করে দেবে।

একই বছর সোভিয়েত গবেষকরা আবহমণ্ডলীয় সাধারণ সংবহন মডেল

ব্যবহার করে "নিউক্লিয়র শীতকাল" ব্যাপারটি এবং নিউক্লিয়র সংঘর্ষের আবহাওয়াগত ও জলবায়ুগত ফল-পরিণামের মূলগত ভৌত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কতিপয় সমীক্ষা চালান; তাঁরা "নিউক্লিয়র শীতকাল" ব্যাপারটির এবং মঙ্গলগ্রহে ধূলি ঝড়ের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণও করেন। বর্তমানে উদ্ভাবিত সাংখ্যিক জলবায়ু মডেল ব্যবহার করে অধিকতর বিস্তারিত একটা বিশ্লেষণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালানো হয়।

যদিও এইসব গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে অনেক ব্যাপারে—কোন কোন আবহমণ্ডলীয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করবার উপায় সহ—পার্থক্য রয়েছে তাহলেও মৌল অভিন্ন সিদ্ধান্তটি হল, নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফলে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটবার সম্ভাবনা তা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ২০ থেকে ৫০ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা হ্রাস করবে।

"নিউক্লিয়র রাত্রি" থেকে "নিউক্লিয়র শীতকালে" উত্তরণের প্রক্রিয়া মনে হয় নিম্নরূপ ঃ সূর্য, স্থলভাগ ও সাগর-মহাসাগরকে উত্তপ্ত করে এবং এটা আবার আবহমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকীরণের চেয়ে আরও ভালভাবে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে সৌরশক্তি প্রবেশ করে। ফলে, আবহমণ্ডল সমপরিমাণ সৌরশক্তি ও ভূ-পৃষ্ঠের তাপ বিকীরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করলে ভূ-পৃষ্ঠ যতটা গরম হত, সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠ তার চেয়ে ৩০ডিগ্রি বেশি গরম হয়। এই ৩০ ডিগ্রি তাপমাত্রার পার্থক্য পৃথিবীর আবহমণ্ডলের তথাকথিত কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় উষ্ণীকৃত উদ্যানের প্রভাব সৃষ্টি করে। আবহমণ্ডলে বিপুল পরিমাণে সূর্যালোকের—যা ঝুলে থাকা কণাগুলি আত্মভূত করে ও ছড়িয়ে দেয়—প্রবেশ ভূ-পৃষ্ঠে প্রবেশকারী সৌরশক্তির পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেবে।

আত্মভূত করবার অধিকতর সামর্থ্যযুক্ত ঝুলন্ত কণা অর্থাৎ এয়ারোসোলগুলি, যেমন ধোঁয়া, ঝুল এবং বিশেষ করে শহরের অগ্নিকাণ্ডের ফলে উৎপন্ন কণাগুলি ভূ-পৃষ্ঠে সৌরশক্তির প্রবেশকে ধুলোর চেয়ে অনেক বেশি করে কমিয়ে দেয়। দাবানল ও শহরের অগ্নিকান্ড হয়ত এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যখন সৌরশক্তিকে আবহমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আত্মভূত করবে আর ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হতে থাকবে আবহমণ্ডলের তাপ বিকীরণ দ্বারা, সূর্যালোক দ্বারা নয়।

আবহমণ্ডলে প্রচণ্ডভাবে বর্ধিত ধোঁয়ার উপাদান এমন এক পরিস্থিতির, উপরে বর্ণিত সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রকল্পগুলি যেমন প্রমাণ করেছে, সৃষ্টি করবে যখন সূর্যালোককে আবহমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আত্মভূত করে নেওয়ায় তা আর ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছবে না। ভূ-পৃষ্ঠ আবার শীতল হতে শুরু করবে, ক্রমশ এ সূর্যালোক শুষে-নেওয়া এয়ারোসোল স্তরের তাপমাত্রার পর্যায়ে পৌঁছবে যে-পর্যায়টি ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কয়েক ডজন ডিগ্রি কম। ফলে,

আবহমণ্ডলীয় উষ্ণীকৃত উদ্যানের প্রভাব আর ক্রিয়াশীল থাকবে না, "নিউক্লিয়র শীতকালের" আগমন ঘটবে। ভূ-পৃষ্ঠ শীতলতর হতে থাকবে আর সূর্যালোকের দ্বারা উত্তপ্ত হওয়া ধোঁয়া উপরে উঠে যে এলাকায় প্রথম অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল সেখান থেকে বহু দূরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আনুমানিক এক মাসের মধ্যে ধোঁয়া ও ধুলোর এক বিশাল মেঘ উত্তর গোলার্ধের উপরে গোটা ট্রপোস্ফীয়ারে ছড়িয়ে পড়বে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করবে।

"নিউক্লিয়র শীতকালের" চিত্রনাট্য অনুসারে দাবানল ও শহরের অগ্নিকাণ্ড একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলবে; আনুমানিক এক মাসের মধ্যে ধোঁয়া ও ধুলোর ক্ষুদ্র কণাগুলির এক ঘন মেঘ শুধু উত্তর গোলার্ধের নয় পরন্তু দক্ষিণ গোলার্ধেরও আকাশকে ছেয়ে ফেলবে, স্থলভাগের তাপমাত্রা এমনকি ক্রান্তীয় মণ্ডলেও হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাবে।

পৃথিবীর উপরে নেমে আসবে এক দীর্ঘ, বিবর্ণ শীতের রাত্রি, মানবজাতির প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা থাকবে না। যে গুটিকয়েক মানুষ বেঁচে থাকবে তারা এমনকি সবচেয়ে আদিম অস্তিত্বের পক্ষেও অনুপযুক্ত অবস্থার মধ্যে পড়বে।

বাস্তব না কল্প-বিজ্ঞান

"নিউক্লিয়র শীতকাল" ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনার সময় যে-প্রশ্নটি কখনো কখনো উত্থাপিত হয় তা হল এটি তত্ত্বগত সম্ভাব্যতার বেশি কিছু নয় কিনা এবং পৃথিবীতে ঘটমান প্রাকৃতিক প্রতীত ব্যাপারগুলির কোন একটি বৈজ্ঞানিক অনুমানকে আংশিকভাবে হলেও সমর্থন করতে পারে কিনা। মঙ্গল গ্রহে ধূলি-ঝড় একটি প্রকৃত ও সু-পরীক্ষিত গ্রহ সংক্রান্ত প্রতীত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে, যে-প্রতীত ব্যাপারটির জলবায়ুগত প্রভাব নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফল-পরিণামের অনুরূপ হতে পারে এবং যা গ্রহটির জমিতে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যরূপে কমিয়ে দেয় ও তার আবহমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এই ধূলিঝড়গুলি সাধারণত মঙ্গল গ্রহ, সূর্য ও পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসবার কালপর্বে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন। এই কালপর্বে গ্রহটি শতকরা ২০ ভাগ বেশি সৌরশক্তি আত্মভূত করে এবং বসন্তকালের শেষে ও গ্রীষ্মকালের গোড়ায় প্রধানত মঙ্গল গ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধের উপক্রান্তীয় ও মাঝারি অক্ষরেখাগুলিতে ধুলোর মেঘ গড়ে ওঠে। প্রতিদিন রাত্রি নেমে আসবার মধ্যে এই মেঘ বৃদ্ধি পায় এবং দিন শুরু হওয়ার মধ্যে ধুলো মঙ্গলপৃষ্ঠে স্থিতিলাভ করলেও আবহমণ্ডলে গড় ধূলির উপাদান অবিচলভাবে বৃদ্ধি পায়। আনুমানিক দুই সপ্তাহের মধ্যে ধুলোর এক আস্তরণ গোটা গ্রহটিকে আবৃত করে। গ্রহের ধূলি-দূষিত আবহমণ্ডলীয় উত্তরোত্তর অধিকতর

পরিমাণে সৌর শক্তি আত্মভূত করতে শুরু করে, ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি বেশি উত্তপ্ত হয় এবং মঙ্গল পৃষ্ঠের চেয়ে বেশি গরম হয়। ধূলি ঝড়ের আঘাতে মঙ্গল গ্রহ স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি বেশি শীতল হয়ে পড়ে। ধুলোর আস্তরণ শুধু যে আবহমণ্ডলের উষ্ণীকৃত উদ্যান প্রভাবকে বিনষ্ট করে তা নয়, পরন্তু তথাকথিত উষ্ণীকৃত উদ্যানের বিরোধী প্রভাব সৃষ্টি করে এবং মঙ্গল-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা আবহমণ্ডলের তাপমাত্রার চেয়ে নেমে যায়।

যদিও মানবজাতির প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে আমাদের গ্রহ বিশ্ব জুড়ে ও আকস্মিক আবহমণ্ডলের এয়ারোসোল "দূষিত", গরমটা মঙ্গল গ্রহে নিয়মিত ঘটছে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রায় যায়ইনি তাহলেও এটা খুবই সম্ভব যে ভূ-পৃষ্ঠের সঙ্গে গ্রহাণুর সংঘর্ষ হয়ত আবহমণ্ডলে বিপুল পরিমাণে ধুলো পাঠিয়েছিল যার ফলে '-গ্রহাণু রাত্রি" ও তার পরে "গ্রহাণু শীতকাল', নেমে এসেছিল। বহু বিজ্ঞানী মনে করেন এরকম বিশাল আকারের জলবায়ুগত বিপর্যয়ের ফলে ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রমাণ করছে যে ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে সংক্ষিপ্ত এই কালপর্বে ২৫ কিলোর বেশি ওজনের প্রাণীগুলির অনেক প্রজাতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যদগারও—শুধু এগুলির বিরাট ধ্বংসকর নিহিত শক্তি নয় পরন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে এর কুফলের কথাও সবার জানা আছে—সেইসব প্রতীত ব্যাপারের অন্তর্গত যেগুলির ফল-পরিণাম সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা ব্যাপক সমীক্ষা করেছেন। অনেক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যদগারের জলবায়ুগত ফল-পরিণাম পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৮১৫ সনে ইন্দোনেশিয়ার তাম্বোরা আগ্নেগিরির অগ্ন্যদগারের উল্লেখ করতে পারি; এই অগ্ন্যদগারের ফলে জাত ১৫০ মন কিলোমিটার ধুলো দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই অগ্ন্যদগারের পরের বছর ১৮১৬ সনটিকে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপে "গ্রীষ্মবিহীন বছর" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। নিউ ইংলণ্ডে জুন মাসেই তুষারপাত হচ্ছিল এবং জুলাই ও আগষ্ট মাসে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছিল। ১৭৮২ ও ১৮৫৬ সনের মধ্যে ১৮১৬ সনেই ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে আঙ্গুর সংগ্রহের মরশুম সবচেয়ে দেরিতে এসেছিল এবং উত্তর আমেরিকা, ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডে ঐ বছরের গ্রীষ্মকালটি ছিল শীতলতম। এও ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তাম্বোরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যদগারের পেছন পেছন বঙ্গদেশে কলেরা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল এবং অভুতপূর্ব শীতল বছর ১৮১৬ সনে ফসল হানি হয়েছিল ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বঙ্গদেশে শুরু হয়ে কলেরা মহামারী ১৯২৩ সনে ককেশাসে পৌঁছেছিল এবং ১৮৩০-৩২ সনে তা ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যদি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যদগার

মাত্র গ্রীষ্মের কয়েকটি মাসের মধ্যেই তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমিয়ে দিতে পারে তাহলে "নিউক্লিয়র শীতকালে" গোটা ভূ-পৃষ্ঠ জুড়ে দুই অঙ্কের তাপমাত্রা হ্রাসের বিপর্যয়কর ফল-পরিণামের কথা কল্পনা করাও সত্যিই কঠিন।

আরও একটি ব্যাপার সম্বন্ধে ভালভবে সমীক্ষা করা হয়েছিল। এটি ছিল কানাডার আলবার্টা প্রদেশে একটি বিরাট দাবানল, এ এক বিশাল ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করেছিল। কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে এই মেঘ পুর্বদিকে চলতে শুরু করে, আমেরিকার ভূ-খণ্ডে দিনের তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি কমিয়ে দেয়, তার পরে অতলান্তিক পার হয়ে পশ্চিম ইওরোপের আকাশে ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার উচ্চতার আবির্ভূত হয়। এই দৃষ্টান্তটি এই ঘটনাটির এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে আবহাওয়ায় ঘটমান কিছু কিছু প্রক্রিয়া ধোঁয়ার মেঘকে আবহমণ্ডলের উপরের স্তরে তুলে দিতে ও পরে বিরাট দূরত্বে ছড়িয়ে দিতে পারে।

দীর্ঘকাল আগেই প্রমাণিত হয়েছে যে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড অগ্নিশিখায় বিধ্বস্ত এলাকাগুলির পক্ষেই শুধু নয় পরন্তু অগ্নিকাণ্ডের ফলস্বরূপ ধোঁয়ার মেঘে আবৃত অনেক বড় বড় এলাকার পক্ষেও এক প্রাকৃতিক দুর্দৈব। সুপ্রাচীন রুশ পাণ্ডুলিপি-গুলিতে ১৩৭১ সনে দাবানলের বিবরণ রয়েছে তখন বাতাসে দু'মাস ধরে ভাসমান ঘন ধোঁয়া খালি চোখে সূর্যের কাল দাগগুলি দেখতে পাওয়া সম্ভবপর করেছিল। অরণ্যের বিশাল এলাকা ও শুকিয়ে যাওয়া জলাভূমিতে আগুন লেগেছিল, মানুষ সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হয়ে বন্য জন্তুরা গ্রামগুলিতে বিচরণ করেছিল এবং নিশানাবোধ হারিয়ে পাখীরা মাটিতে পড়ছিল।

১৯০৮ সনের ৩০ জুন তারিখে তুঙ্গুস্কায় উল্কাপাত জনিত বিস্ফোরণ দাবানলের সৃষ্টি করেছিল যা পাঁচ দিন ধরে জ্বলছিল। সাইবেরিয় তৈগার প্রায় আট কিলোমিটার উপরে এই উল্কার বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং এর বিস্ফোরণ শক্তি ছিল ১০ মেগাটন নিউক্লিয়র বোমার সমান।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, তুঙ্গুস্কা উল্কাপাতের ফলাফলকে একটি শক্তিশালী নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আবহমণ্ডলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় উল্কাপিণ্ডটি বাতাসকে এমন এক তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করেছিল যে তাপমাত্রায় নাইট্রিক অক্সাইডের জন্ম হয়। কোন কোন হিসাব অনুসারে, এভাবে যে-পরিমাণ অক্সাইডের জন্ম হয় তা একটি ৬০০০ মেগাটন নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফলে জাত অক্সাইডের সমান। তুঙ্গুস্কা উল্কা বিস্ফোরণ আবহমণ্ডলে ধূলির উপাদান প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়েছিল এবং নাইট্রোজেন উপাদান হ্রাস করেছিল।

১৯১৫ সনে সাইবেরিয়ায় বিরাট দাবানলগুলি ১২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পুড়িয়ে দিয়েছিল। ঘন ধোঁয়া দানা ফসল তোলা দু'সপ্তাহ দেরি করে

দিয়েছিল এবং দানাগুলির আকার ক্ষুদ্রতর হয়েছিল। ৫০ দিন ধরে ধোঁয়া ইওরোপের আকাশের একটা এলাকাকে ছেয়ে ফেলেছিল এবং কোন কোন এলাকায় ধোঁয়ার আস্তরণ এত ঘন ছিল যে কয়েক পা'র বেশি দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছিল না।

১৯৭৫ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইওরোপীয় অংশের মধ্য অঞ্চলগুলি যে ভয়ঙ্কর খরার কবলিত হয়েছিল সেই খরাও অনেক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়েছিল এবং ধোঁয়া পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল। একটা ফিতের আকারের ধোঁয়ার মেঘ—৫৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা ও ১০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার চওড়া—বুশ সমভূমি থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অগ্নিকাণ্ডের পরে কয়েক মাস ধরে আবহমণ্ডলীয় স্বচ্ছতা কম ছিল।

বিশ্বজোড়া "নিউক্লিয়র রাত্রি" ও "নিউক্লিয়র শীতকাল" ব্যাপারটা সম্বন্ধে মৌল ধারণার বিকাশ ঘটেছিল ১৯৮৩ সনে। পরবর্তী গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল "নিউক্লিয়র শীতকালের" পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ফল-পরিণাম সম্বন্ধে সমীক্ষার উপরে এবং অনেক নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফলে আবহমণ্ডলে ও ভূ-পৃষ্ঠের উপরে ঘটমান ভৌত প্রক্রিয়াগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখবার উপরে। শান্তির জন্য, নিউক্লিয়র বিপদাশঙ্কার বিরুদ্ধে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কমিটি কর্তৃক পরিচালিত "নিউক্লিয়র শীতকালের" পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ফল-পরিণাম সম্বন্ধে সমীক্ষার পর "নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিশ্বজোড়া ফল-পরিণাম ও উন্নয়শীল দেশগুলি" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আধুনিক বিজ্ঞান যদিও নিউক্লিয়র যুদ্ধের জঘন্য ফল-পরিণামের এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলির পরিবেশ ও আর্থব্যবস্থার উপরে নিউক্লিয়র যুদ্ধের অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে সমর্থ হয়নি তাহলেও এযাবৎ সংগৃহীত তথ্যাদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পক্ষে যথেষ্ট যে আফ্রিকায় এবং এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষির অনিবার্য লোপ ঘটবে। "নিউক্লিয়র শীতকালের" ঠাণ্ডা আর অন্ধকারে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসলগুলি বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এইসব ফসলকে পুনরুদ্ধার করা বলতে গেলে অসম্ভব হবে। পৃথিবীতে অক্সিজেনের অন্যতম মূল উৎস ও জৈব জীবনের সংরক্ষণাগার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যগুলি এমনকি সাময়িক অন্ধকার ও হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রার অভিঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ এগুলি একমাত্র একটা সংকীর্ণ তাপমাত্রার পরিধির মধ্যেই টিকে থাকতে পারে এবং এগুলি তাপমাত্রা ও আলোর তীব্রতার তীক্ষ্ণ ওঠানামাকে সহ্য করতে অসমর্থ। নিউক্লিয়র যুদ্ধ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি তাপমাত্রায় জীবন, বুভুক্ষা, ব্যাধি ও শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে জনসমষ্টির অধিকাংশের নিয়তি করে তুলবে।

"নিউক্লিয়র শীতকালের" সমর্থক ও বিরোধীরা

নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিশ্বজোড়া জলবায়ুগত ফল-পরিণামের তত্ত্ব অধিকতর বিকাশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে যেসব ভৌতিক ও আবহবিদ্যাগত সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে সেগুলি সম্বন্ধে বলা যায়, যেসব বিজ্ঞানী এই সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করছেন প্রকৃত পক্ষে তাঁদের প্রায় সবাই একবাক্যে এই মত ঘোষণা করেন যে আবহমণ্ডলে সমানভাবে ছড়ানো ধোঁয়া ও ঝুল স্থলভাগের উপরে তাপমাত্রার প্রচণ্ড হ্রাস ঘটাতে পারে। সবচেয়ে বিতর্কমূলক হল বিরাট আকারে অগ্নিকাণ্ড, ব্যাপকভাবে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়া এবং আবহমণ্ডল থেকে এয়ারোসোল কণাগুলি ধুয়ে যাওয়ার তত্ত্বটি। এটা একেবারে পরিষ্কার যে এই সব প্রক্রিয়াই পূর্ণবয়ব মডেলের উপরে পরীক্ষামূলকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে না। অপর দিকে, তত্ত্বগত গবেষণা ও ঐসব প্রক্রিয়ার গাণিতিক মডেল সৃষ্টির জন্য অসংখ্য গবেষণা সংস্থার বিপুল পরিমাণে প্রয়াস দরকার হবে। এতৎসত্ত্বেও, আবহমণ্ডলে ও ভূ-পৃষ্ঠে ঘটমান ভৌত প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে বর্তমানে লভ্য তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় যে "নিউক্লিয়র শীতকালের" আবির্ভাব ঘটাবে এমন ঘটনাবলী বস্তুত ঘটতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ অভিযানের কাঠামোর মধ্যে নানা সেমিনার, সভা ও আলোচনা চক্রে, দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় যোগাযোগ চলাকালে এবং কতিপয় আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিশ্বজোড়া জলবায়ুগত ও পরিবেশগত ফল-পরিণাম তথা অনেকগুলি নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের স্থানীয়, আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করছেন। উদাহরণস্বরূপ, "নিউক্লিয়র যুদ্ধের পরিবেশগত ফল-পরিণাম" শীর্ষক প্রকল্পটির উল্লেখ করতে পারি, বৈজ্ঞানিক ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক পরিষদের সহায়ক সংস্থা পরিবেশের সমস্যাদি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কমিটি এই প্রকল্পটি রচনা করেছিল। প্রকল্পটি এমন একটি বিষয়মুখ, উপযুক্ত ও একই সময়ে সুস্পষ্টভাবে লিখিত রিপোর্টের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে যে-রিপোর্টটিতে মনুষ্যজাতি ও গোটা বায়োস্ফীয়ার এই দুইয়েরই পক্ষে নিউক্লিয়র যুদ্ধের সম্ভাব্য ফল-পরিণামের বিবরণ দেওয়া হবে।

১৯৮৪ সনের মে মাসে লেনিনগ্রাদে "নিউক্লিয়র যুদ্ধের জলবায়ুগত ফল-পরিণাম ও বায়োস্ফীয়ারের উপরে এর অভিঘাত" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স,

অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ডেনমার্ক, সুইডেন ও স্পেন থেকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রায় ৫০ জন বিজ্ঞানী যোগ দেন। অংশগ্রহণকারীগণ এই মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে নিউক্লিয়র সংঘর্ষ বাধলে মানবজাতি ও সমস্ত জীবিত বস্তুকে "নিউক্লিয়র শীতকালের" আগমনের সম্মুখীন হতে হবে, এমনকি নিউক্লিয়র যুদ্ধের পরও যারা বেঁচে থাকবে তাদের পক্ষে "নিউক্লিয়র শীতকাল" হবে মারাত্মক।

১৯৮৪, জুন মাসে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ অভিযানের কাঠামোর মধ্যে লেনিনগ্রাদে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে সোভিয়েত ও আমেরিকান চিকিৎসক ও পদার্থ বিজ্ঞানীরা নিউক্লিয়র যুদ্ধের আবহাওয়াগত, জলবায়ুগত, জীববিদ্যাগত ও চিকিৎসাগত বিপর্যয়কর ফল-পরিণাম সম্বন্ধে হুশিয়ারী প্রচার করেন।

একথা বলতেই হবে যে নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফল-পরিণাম সম্বন্ধে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পরস্পর-বিরোধী অভিমত পোষণ করেন। কেউ কেউ মনে করেন তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর প্রয়োজন নেই আবার অন্যরা মনে করেন নিউক্লিয়র যুদ্ধ বেধে যেতে দেওয়া হলে মনুষ্যজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হবার সমূহ কারণ রয়েছে। আবার অন্য এক দল আমেরিকান শাসক মহলের যুদ্ধবাজদের লেজুড় হয়ে নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপর্যয়কর ফল-পরিণামকে খাটো করে দেখাবার জন্য সম্ভাব্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করছেন।

উদাহরণস্বরূপ, **নেচার** পত্রিকা ১৯৮৪, আগষ্ট সংখ্যায় হাইড্রোজেন বোমার অন্যতম জনক এডওয়ার্ড টেলারের "নিউক্লিয়র যুদ্ধের ব্যাপক ফল-পরিণাম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে তেজস্ক্রিয় ভস্মাবশেষ ও ওজোন স্তরের হ্রাস এক সময় বিপর্যয়কর বলে পরিগণিত হলেও নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ যে প্রকৃত ভৌতিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটাবে তার তুলনায় এখন তা তুচ্ছ বলেই মনে হয়। এডওয়ার্ড টেলার বলছেন যে "নিউক্লিয়র" অগ্নিকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য ধোঁয়ার পরিমাণ সম্বন্ধে এবং পরবর্তীকালে আবহবিদ্যাগত বিবর্তন সম্বন্ধে ঠিক ঠিক তথ্যাদির অভাব "নিউক্লিয়র শীতকালের" প্রতিক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তি ক্ষইয়ে দিচ্ছে।

নিজের অভিমতের সমর্থনে লেখক কিছু কিছু বিশ্লেষণমূলক তথ্য এবং আবহমণ্ডল থেকে ধোঁয়া অপসারণ ত্বরান্বিত করতে ও এইভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শীতল হওয়া মন্থর করতে পারে এমন আবহমণ্ডলীয় প্রক্রিয়াদির কথা উদ্ধৃত করেছেন। আমেরিকান ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তসমূহ নাকচ করে দিয়ে টেলার এগুলিকে বিশ্বাস্য নয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর নিজের সিদ্ধান্তেরই অধিকাংশটা প্রত্যয় উৎপাদক নয়। কারণ আবহমণ্ডল থেকে ধোঁয়া অপসারণ ত্বরান্বিত করে এমন প্রক্রিয়াগুলির পাশাপাশি এমন অন্যান্য প্রক্রিয়া

রয়েছে যেগুলি কণাগুলির লম্বালম্বি ও খাড়াখাড়ি ছড়িয়ে যাওয়ায় সাহায্য করে। আবহমণ্ডলে ধোঁয়া ও ঝুল উপাদান বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক এই প্রক্রিয়াগুলির তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়।

এই প্রবন্ধটির প্রকাশ ১৯৮৪, ২১-২৮ আগষ্ট তারিখে তালিনে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক মেঘ ভৌতবিদ্যা সম্মেলনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। এই সম্মেলনে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের গবেষণা নিবন্ধগুলিও টেলারের সিদ্ধান্তগুলি খণ্ডন করেছিল।

বিশ্ব পরিবেশগত বিপর্যয়

এটা সম্ভব যে প্রাথমিক নিউক্লিয়র বিস্ফোরণগুলির স্থল থেকে বহু দূরে অবস্থিত এলাকাগুলির অধিবাসীরা শুরুতে বিস্ফোরণগুলি দেখতে ও শুনতে পারে না। কিন্তু নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের সঙ্গী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঘাতের দ্বারা সৃষ্ট নানা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা স্থলভাগে ও মহাকাশে যোগাযোগ লাইন, বিদ্যুৎ প্রেরণ লাইন, কম্পিউটার প্রভৃতির ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া এবং ঐসব এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ ভেঙ্গে পড়ার ন্যায় জাজ্বল্যমান লক্ষণগুলি থেকে তারা নিউক্লিয়র যুদ্ধ শুরু হবার কথা জানতে পারবে। তারা কিছুটা বিলম্বের পর তখন ভূকম্পন নির্ণায়ক স্টেশনগুলি থেকে সংকেত পাবে। ঘটনা-পরম্পরায় এর পর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে বিপুল বায়ুপ্রবাহের আগমন ঘটবে, অবহমণ্ডলে ধোঁয়া, ধুলো ও ছাই জমা হবার ফলে উপরের আকাশ ক্রমশ কালো হয়ে যাবে। আবহমণ্ডলের দূষণ এর স্বচ্ছতা প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেবে, ফলে আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে সালোক সংশ্লেষের প্রক্রিয়াকে—পৃথিবীর জীবন্ত পরিবেশের অস্তিত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই প্রক্রিয়া বছরে পৃথিবীতে শতকরা ৯৮ ভাগ প্রাণ-পুঞ্জ সৃষ্টি করে—অব্যাহত ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সূর্যকিরণের সামর্থ্য প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পাবে। অন্ধকার জীবন্ত প্রকৃতিকে ধ্বংস করবার অন্যতম সর্বাধিক শক্তিশালী কারণ হিসাবে কাজ করবে।

আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এমনকি একটা সাময়িক "নিউক্লিয়র শীতকালেও" উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যসমূহ বেঁচে থাকতে পারবে না। একমাত্র "নিউক্লিয়র শীতকালের" উপাদানটিরই ফলস্বরূপ বায়োস্ফীয়ারে অক্সিজেন পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে পৃথিবীতে অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু এমন কি যদি কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি বেঁচেও যায় তাহলেও এগুলির জীবন চক্র গুরুতররূপে বিশৃংখল হয়ে পড়বে।

বস্তুত, পৃথিবীতে জীবন একটি অখণ্ড গ্রহীয় প্রক্রিয়া ; এর মধ্যে জড়িত রয়েছে জৈব বস্তুর প্রাথমিক উৎপাদনকারী উদ্ভিদ কর্তৃক সৌর শক্তি, কার্বণিক এসিড, জল ও খনিজ পদার্থ আত্মভূত করা, জন্তু ও মাইক্রোব কর্তৃক এগুলির বহুধা পুনঃপ্রক্রিয়ন এবং জৈব বস্তুকে প্রাথমিক স্তরের খনিজ সামগ্রীতে পরিণত করতে ক্ষুদ্রজীবগুলির কাজ। এই সবগুলি প্রক্রিয়ার বিশ্বজোড়া গতিময় ভারসাম্য শুধুমাত্র বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের জন্যই নয় পরন্তু ভূপৃষ্ঠে, জলে ও আবহমণ্ডলে ঘটমান রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির জন্যও দায়ী।

এমন কি শান্তির সময়েও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিবেশকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে—আবহমণ্ডলের গ্যাসের গঠন, জল সম্পদ প্রভৃতিকে বদলে দিয়ে। বৃহদাকারে নিউক্লিয়র সংঘর্ষ অনিবার্যভাবেই বড় ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তন নিয়ে আসবে, বিশেষ করে অতি "ভেদ্য" উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলগুলিতে।

আবহমণ্ডলে দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষতিকর পদার্থসমূহের প্রবেশ হবে বিশ্বজোড়া বিরাট গুরুত্বসম্পন্ন একটি উপাদান। অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ ও জ্বালানি ডিপো-গুলির ধ্বংসসাধন বাতাসে বিপুল পরিমাণে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ এবং কার্বন মনোক্সাইড, সায়ানাইড, ডায়োক্সিন ও অন্য বহুবিধ বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে প্রেরণ করবে যা সমস্ত জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদকে, বিশেষ করে মানুষ ও অন্যান্য উচ্চতর রূপের জীবনকে আঘাত করবে।

যুদ্ধের অঞ্চলগুলিতে সংঘর্ষের প্রথম কয়েকদিনে কোটি কোটি মানুষ ও বিরাট সংখ্যক পশু মারা যাবে। মৃতদেহগুলি ছড়িয়ে থাকার ফলে ব্যাপক আকারে ক্ষয়কারী পদার্থ ও পচনকারী অনুজীব ছড়িয়ে পড়বে। মহামারীর বাহকসহ কিছু কিছু প্রজাতির পোকার সংখ্যা বিরাটভাবে বৃদ্ধি পাবার একান্ত সম্ভাবনা। ব্যাপক আকারে মানব জীবনের বিনাশ, চিকিৎসা সহায়তার অভাব ও পানীয় জলের মেইন লাইন ভেঙ্গে পড়া প্রভৃতির দ্বারা সৃষ্ট মহামারী ছাড়াও বিস্ফোরণ জীবাণু অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার ও বিষাক্ত গ্যাস ডিপোগুলি উড়িয়ে দেওয়ার ফলে অন্যান্য ধরনের মহামারী দেখা দেবে।

আবহমণ্ডলে পশ্চিম থেকে পূবে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে ধোঁয়া, ঝুল ও ধূলিবাহী বাতাসের সংবহনও বিশ্ব জুড়ে নিউক্লিয়র বিকীরণজনিত, জীববিদ্যাগত ও রাসায়নিক সংক্রমণে দান রাখবে।

"নিউক্লিয়র শীতকালের" জীববিদ্যাগত ফল-পরিণাম সম্বন্ধে গবেষণা চালানো অতিমাত্রায় দুরূহ কারণ, আবহমণ্ডলীয় ফল-পরিণাম সম্বন্ধে সমীক্ষার মতই, গবেষক সৌভাগ্যক্রমে প্রচণ্ড শীতল আবহাওয়ায় বিশাল উষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্যের প্রতিক্রিয়াকে জড়িত করে কোনরূপ পূর্ণাকার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে অপারগ। কিন্তু নানা ফসল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো এবং মধ্যম ও উচ্চতর অক্ষাংশে আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ চালানো কিছু প্রাথমিক ফল দান করতে পারে।

তাপমাত্রা ক্রমে ক্রমে শূন্যের নীচে ২০ ডিগ্রি নেমে যাওয়া পর্যন্ত শীতকালীন গম বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু গ্রীষ্মকালে সক্রিয় বৃদ্ধির কালপর্বে তাপমাত্রা অকস্মাৎ শূন্যের নীচে পাঁচ ডিগ্রিতে নেমে গেলে এই গম মরে যাবে। আল্পাইন পর্বতের পাইন গাছ শীতকালে শূন্যের নীচে ৫০ ডিগ্রি তাপমায় বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু গ্রীষ্মকালে শূন্যের নীচে পাঁচ ডিগ্রি নেমে গেলে এই গাছ মরে যেতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলের উদ্ভিদ তাপমাত্রার ওঠানামায় এমনকি অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। ধানের ফুল ধরার সময় তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রিতে নেমে গেলে এশিয়ার বহু দেশে এই ফসলটির সম্পূর্ণ হানি হয়।

একমাত্র "নিউক্লিয়র রাত্রির" অন্ধকারই সাগরে ও স্থলভাগে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেবে।

দীর্ঘকাল ধরে অন্ধকার, তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ ও অতি-বেগুনি বিকীরণ সাগরে জীবনের মারাত্মক ক্ষতি করবে এবং তা আর মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস থাকবে না।

কৃষিতে অনিবার্য বিশৃংখলা এবং ফসল ও খাদ্যের মজুতের বিনাশ পরিস্থিতিকে ঘোরালো করবে। শক্তি ও কাঁচা মালের যোগানের অভাবে, এবং বিরাট জনসমষ্টি মহামারীর কবলিত হওয়ায় শিল্প ও কৃষি পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে।

জলবায়ুগত ও জীববিদ্যাগত কারণগুলির মোট প্রভাব সম্বন্ধে সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে যে একটা সর্বাত্মক নিউক্লিয়র যুদ্ধের ফলে হয়ত মনুষ্য প্রজাতিগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

একদল আমেরিকান বিজ্ঞানী পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষে "নিউক্লিয়র শীতকালের" ফল-পরিণামের যে বিবরণ দিয়েছেন আমরা তা পুনঃপ্রকাশ করতে চাই।

প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে বছরের সময় নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র যে অতিমাত্রায় শীতল আবহাওয়া জেঁকে বসবে যে উদ্ভিদ জীবনের বিপুল ক্ষতি করবে, বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে এবং উত্তর গোলার্ধের মধ্যম অক্ষাংশগুলিতে যেখানে পৃথিবীর জনসমষ্টির অধিকাংশের বাস। আলোর তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পাওয়ায় সালোক সংশ্লেষ হ্রাস পাবে এবং উদ্ভিদ মোটে জন্মাবে না। শীতল আবহাওয়া, টাটকা জলের অভাব এবং প্রায় সার্বিক অন্ধকার বিরাট সংখ্যক পশুর মৃত্যু ঘটাবে। শূন্যের প্রায় কাছাকাছি তাপমাত্রা, বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধের মধ্যম অক্ষাংশের মহাদেশীয় অঞ্চলগুলিতে, টাটকা জলের অগভীর উৎসগুলিকে হিমায়িত করে দেবে। ফটো-প্ল্যাঙ্কটনের অ-পুনরুৎপাদন সমুদ্র ও টাটকা জলের মাছ ও পশুর বহু প্রজাতির খাদ্যের উৎস বিনষ্ট করবে। খাদ্যের সম্ভাব্য যে-উৎস বাকী থাকবে তা তেজস্ক্রিয় ও রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা এত বেশি সংক্রামিত হবে যে তা খাবার অনুপযুক্ত হয়ে উঠবে।

শীতল আবহাওয়া ও নীচু স্তরে আলোর তীব্রতা গোটা গ্রহ জুড়ে কৃষি উৎপাদন স্তব্ধ করে দেবে। নিউক্লিয়র আক্রমণের শিকার দেশগুলির খাদ্যের মজুত বিনষ্ট অথবা সংক্রামিত হবে। খাদ্য-উৎপাদনকারী দেশগুলি আর অভাবগ্রস্ত দেশগুলিকে খাদ্য রপ্তানি করতে পারবে না।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের ফলে সারা পৃথিবীতে

তৎক্ষণাৎ ২০০ থেকে ৩০০ কোটি লোক মারা যাবে। "নিউক্লিয়র রাত্রি" ও "নিউক্লিয়র শীতকালের" আগমন, পর্যাপ্ত আবাসন ও জ্বালানি মজুদের অভাব, তেজষ্ক্রিয় ও রাসায়নিক সংক্রমণ, টাটকা জলের ঘাটতি, বুভুক্ষা ও চিকিৎসা সাহায্যের অভাব নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের শিকারের সংখ্যা বহু গুণ বাড়িয়ে দেবে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শক্তির যোগান, পরিবহন, যোগাযোগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা আর কাজ করবে না। প্রাণী জীবনের উচ্চতর রূপগুলির বিশেষ করে ক্রান্তীয় অঞ্চলে, খুব সম্ভব নিয়তি হবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। মনে হয় সংগঠিত চাষবাষের পুনরুদ্ধার হবে খুবই অনিশ্চিত, তেজষ্ক্রিয় সংক্রমণ থেকে যাবে এবং নানাবিধ মহামারীর প্রকোপ ঘটবে।

শুধুমাত্র মানুষের পক্ষে নয় পরন্তু অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীব, পাখী ও পোকামাকড়ের পক্ষেও বিকীরণ অতিমাত্রায় বিপজ্জনক। "বিকীরণ অভিঘাত" অরণ্যের, বিশেষ করে স্বেচ্ছাকৃত বৃক্ষের অরণ্যের, গুরুতর ক্ষতিসাধন করবে। উদ্ভিদ যেহেতু মূলের মাধ্যমে তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ আত্মভূত করে সেজন্য খাদ্যের উৎসগুলিও সংক্রামিত হবে।

বিরাট আকারে অগ্নিকাণ্ড মোট অরণ্যের প্রায় ২০ শতাংশ, স্তেপভূমির ১৫ শতাংশ ও উত্তর গোলার্ধে চাষযোগ্য জমির ৫০ শতাংশ পুড়িয়ে দেবে। নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ ও বিরাট আকারে অগ্নিকাণ্ড আবহমণ্ডলে বিপুল পরিমাণে কার্বনিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ইথাইলেন, প্রপাইলেন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ পাঠাবে। এইসব গ্যাস এমন এক ফটোকেমিক্যাল ধোঁয়াশা সৃষ্টি করবে যা সমস্ত জীবিত জিনিষের মারাত্মক ক্ষতি করবে। প্রতি বারে আবহমণ্ডলে যে গড় পরিমাণ নাইট্রিক ও সালফিউরিক যোগ প্রবেশ করে তা আনুমানিক দশগুণ বৃদ্ধি পেলে বিশাল এলাকা জুড়ে "এসিড" বৃষ্টি ও তুষারপাত হবে এবং গড়ে জমিতে এসিডের উপাদান পাঁচ গুণ বাড়বে। ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি ও তুষারের সঙ্গে মিলে সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড পতন উদ্ভিদ, টাটকা জলাশয় ও প্রাণী জীবনের ক্ষতি করবে এবং বাড়িঘর ও ধাতুনির্মিত কাঠামোর ক্ষয় ঘটাবে। বর্তমানে, মার্কিন শ্রমশিল্পগুলি প্রতি বছর আবহমণ্ডলে প্রায় তিন কোটি টন সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড পাঠায় যা ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী কানাডায় প্রচুর "এসিড" বৃষ্টিপাত ঘটাচ্ছে, সেখানে গত কয়েক বছরে একমাত্র অন্টারিও প্রদেশে এককালের ২০০টি স্ফটিক স্বচ্ছ জলের হ্রদ ইতিমধ্যেই গুরুতর রূপে দূষিত হয়েছে।

এর চেয়েও দশগুণ বেশি "এসিড" বৃষ্টি বিশাল এলাকা জুড়ে পরিবেশকে ধ্বংস করবে। অগ্নিকাণ্ড এবং "তেজষ্ক্রিয়" ও "এসিড" বৃষ্টির মিথষ্ক্রিয়া সর্বত্র বিরাট পরিমাণে আগাছার জন্ম দেবে।

পাখীদের মৃত্যু জঙ্গলের পোকামাকড়ের ত্বরিত বংশবৃদ্ধিতে দান রাখবে।

একত্রে মিলে এইসব উপাদান এককালের অরণ্য অঞ্চলকে দ্রুত জলাভূমিতে পরিণত করবে এব উচ্চতর এসিড উপাদান, ভূমি ক্ষয় এবং প্রাণীর অনুপস্থিতির দরুন স্তেপভূমি জুড়ে আগাছা জন্মাতে শুরু করবে।

উষ্ণমণ্ডলে ও এর নিকটবর্তী বৃষ্টি ও মৌসুমী-বায়ুজাত অরণ্য ও সাভানাভূমি জলবায়ুগত অভিঘাত থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। অতিমাত্রায় ছড়ানো ভূগর্ভস্থ শিকড়ের অভাবে উষ্ণমণ্ডল ও নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্রুত ভূমি ও জলের ক্ষয় ঘটাবে এবং পরবর্তীকালে এইসব এলাকা "বন্ধ্যা" হয়ে পড়বে। সাভানাভূমি পরিণত হবে আধা-মরুভূমি ও পরে মরুভূমিতে। যে জলাভূমি ও অগাছার ক্ষেত অরণ্য ও স্তেপভূমির স্থলাভিষিক্ত হবে সেগুলি আমাদের গ্রহে উদ্ভিদ জীবনের ভূগোল পুরো বদলে দেবে।

আপেক্ষিক নিরাপত্তার মোহ

যদিও এশিয়ার কিছু কিছু দেশ হয়ত নিউক্লিয়র যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়বে না, তাহলেও "নিউক্লিয়র শীতকাল" ও পরিবেশ বিপর্যয়, বিপুল জীবন-হানি ও অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলার ন্যায় নিউক্লিয়র সংঘর্ষের অন্যান্য পরিণামের কথা উল্লেখ না করেও, জাতীয় সীমানাগুলি ছাড়িয়ে যাবে এবং গোটা পৃথিবীকে আঘাত করবে।

একটা সর্বাত্মক নিউক্লিয়র যুদ্ধ সংক্রামক ব্যাধিসমূহের বিস্তার রোধ করে এমন স্বাস্থ্যবিধিমূলক সমস্ত প্রতিবন্ধক অপসারিত করবে। ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস জল সরবরাহকে দূষিত করবে। বিকীরণে কম প্রভাবিত হয় এমন মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় পচন ধরা মানুষ ও পশুর শবে ভোজ বসাবে এবং সংক্রামক ব্যাধি বহনকারী পোকামাকড়ের বংশবৃদ্ধি ঘটবে শত শত কোটি হারে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলি সহ সমস্ত জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক-বন্ধন পঙ্গু হয়ে যাবে এবং শহরে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিশৃংখল হয়ে পড়বে, সভ্যতা হবে বুভুক্ষা, মহামারী ও সম্ভবত চরম বিশৃংখলার শিকার।

লক্ষ লক্ষ শহরবাসী খাবারের সন্ধানে গ্রামাঞ্চলে এবং সেখানে তখনও পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনের যেসব ক্ষেত্র কাজ করছে সেগুলিকে বিশৃংখল করে দেবে। জ্বালানির অভাবের দরুন পরিবহন স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং অর্থনৈতিক অব-কাঠামো পঙ্গু হয়ে পড়বে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অসমাধেয় সমস্যাদির সম্মুখীন হবে। ক্ষুধা, শীতল আবহাওয়া ও অন্ধকারের আবির্ভাব ঘটবে বলে গ্রামাঞ্চলে খামারজাত সামগ্রীর যোগানদাররা তাদের খাদ্য মজুত হাতছাড়া করতে অনিচ্ছুক হবে কারণ ঘরে তুলবার মত ফসল হয়ত আর থাকবে না। আমদানিকৃত মালমসলা ব্যবহারকারী কারখানাগুলি ও রপ্তানিমুখী কারখানাগুলি বন্ধ করে দিতে হবে কারণ পণ্যদ্রব্য ও তৈরি পণ্যাদির বিশ্ব বাজারের অস্তিত্ব থাকবে না।

সুদূর, দুরধিগম্য এলাকাগুলিতে মাত্র সীমিত সংখ্যক পরিবার ও পল্লী টিকে থাকবার সম্ভাবনা থাকবে আর যে-অর্থাব্যবস্থা বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যাকে খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধাদি যোগাচ্ছে তার মেরুদণ্ডটিই ধ্বংস হয়ে যাবে। কথান্তরে, নিউক্লিয়র যুদ্ধ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অধিকাংশ জনসমষ্টির জন্য নিয়ে আসবে ক্ষুধা ও ব্যাধিজনিত মৃত্যু।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানা ও বিদ্যুৎ শক্তি

স্টেশনগুলির উপরে নিউক্লিয়র আক্রমণের ফল হবে বিশেষভাবে বিপজ্জনক। ১৯৮২ সনের গোড়ার দিক নাগাদ ২৩টি দেশে ২৭২টি নিউক্লিয়র বিদ্যুৎ রিঅ্যাক্টর চালু ছিল। বর্তমানে নির্মীয়মান রয়েছে ২৩৬টি বিদ্যুৎ রিঅ্যাক্টর। ২০০০ সনের মধ্যে ৫০টি দেশে নিউক্লিয়র বিদ্যুৎ কারখানায় উৎপাদন হবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ কারখানায় বিস্ফোরণ সমস্ত তেজাস্ক্রিয় বস্তুকে বাষ্পীভূত করবে এবং দ্রুত আবহমণ্ডলে উঠে যাবে এক বিরাট আগুনের গোলা। নিউক্লিয়র বিদ্যুৎ কারখানাগুলিতে মজুত করা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলি নিউক্লিয়র বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় নিয়ন্ত্রক নিয়মগুলি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। নিউক্লিয়র বোমা বিস্ফোরণের পর কয়েক দিনের মধ্যেই বিকীরণ সম্পর্কিত পরিস্থিতি ঐ বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা বহুল পরিমাণে নির্ধারিত হবে ; পরে তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির দীর্ঘকাল স্থায়ী অংশটি বিশাল দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ও বিরাট বিরাট এলাকা সংক্রামিত করে হয়ে উঠবে প্রধান উপাদান।

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৮২ সনের শরৎকালে সোভিয়েত সরকার প্রস্তাব করেছিল যে এমনকি প্রচলিত অস্ত্রাদি ব্যবহার করেও শান্তিপূর্ণ নিউক্লিয়র কারখানাগুলির পূর্বকল্পিত ধ্বংসসাধন নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করে আক্রামণ বলে, কথান্তরে, এমন, আক্রমণ বলে গণ্য করা হোক যাকে ইতিমধ্যেই অতীতে রাষ্ট্রসংঘ মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে সর্বাধিক গুরুতর অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছে।

রাসায়নিক ও জীবাণুতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কারখানগুলির উপরে কিংবা রাসায়নিক জীবাণুতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মজুদকরণ সুবিধাদির উপরে পূর্বকল্পিত আক্রমণের ফল-পরিণামও গুরুতর, যে ফল-পরিণাম সম্বন্ধে ভাবষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

যেহেতু যুদ্ধের ইতিহাসে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করবার ইচ্ছাকৃত প্রয়াসের বহু ঘটনা রয়েছে সেজন্য এধরনের পূর্বকল্পিত ধ্বংসসাধনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চাদপসরণকারী নাৎসী ফৌজ বাঁধ উড়িয়ে দিয়ে ডাচ ভূখণ্ডের বিরাট এলাকা প্লাবিত করেছিল। কোরিয়া যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনী দেশের উত্তরাংশে সেচ-ব্যবস্থার উপরে গোলা বর্ষণ করেছিল। ১৯৫০ সনে মালয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার সময় ব্রিটিশরা ফসল পুড়িয়ে দেবার জন্য আগুনে গোলা ব্যবহার করেছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন ফৌজ ফসল ও অরণ্য—যা ভিয়েতনামী গেরিলা ও বেসামরিক অধিবাসীদের খাদ্য ও আশ্রয় যোগাত—ধ্বংস করবার জন্য আগুনে বোমা ও লতাগুল্মনাশক ব্যবহার করেছিল। ১৯৬১ ও ১৯৭৩

সনের মধ্যে ভিয়েতনামে প্রায় ছয় লক্ষ হেক্টার অরণ্য ও চার লক্ষ হেক্টার চাষের জমি বিনষ্ট করা হয়েছিল।

নিউক্লিয়র যুদ্ধ পরিবেশের যে-পরিমাণ ধ্বংসসাধন করতে পারে তার একটা সাময়িক ধারণা পাওয়া যাবে এই ঘটনা থেকে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেখানে ইওরোপের দুই লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে চলেছিল সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৩৩ লক্ষ কিলোমিটার এলাকা বিধ্বস্ত করেছিল। নিউক্লিয়র যুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহের এলাকা অনুরূপ আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পাবে একথা ধরে নিলে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণগুলির আঘাত পড়বে পৃথিবীর স্থলভাগের ৫০ শতাংশে। এই হল নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপর্যয়কর ফল-পরিণামের সার্বিক, যদিও মোটেই সম্পূর্ণাঙ্গ নয়, চিত্র।

পৃথিবীর কোন স্থানই যুদ্ধ তৎপরতার অঙ্গন থেকে নিরাপদে বিচ্ছিন্ন কিংবা নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের বিপর্যয়কর ফল-পরিণামের দ্বারা অনাক্রান্ত থাকবে না। নিউক্লিয়র সংঘর্ষ থেকে নিরাপদে "বাহিরে বসে থাকা যাবে" এরকম আশা করাটা হবে এক বিপজ্জনক মোহ।

আসন্ন বিপদাশঙ্কা লাঘব ও দূর করবার নির্ভরযোগ্য উপায়সমূহ

আজকে অনিবার্যভাবেই যে প্রশ্নটা উঠছে সেটা হল নিউক্লিয়র বিপর্যয় এড়াবার কোন নির্ভরযোগ্য উপায় আছে কিনা।

স্পষ্টতই, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে "নিউক্লিয়র শীতকাল" নিবারণ করবার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করতে হবে যাতে করে নিউক্লিয়র সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাতিল করে দেওয়া যায়। সেই লক্ষ্য সবচেয়ে ভালভাবে অর্জন করা যেতে পারে সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র-প্রেরণ ব্যবস্থা ও সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র মজুত ধ্বংস করে এবং পাশাপাশি এগুলির উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক এই অভিপ্রায় থেকেই ১৯৬২ সনে কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত চুক্তির খসড়া পেশ করেছিল। এমন হতেই পারে যে আজকে পশ্চিম এই সমস্যার আমূল সমাধানের দিকে অবিলম্বে অগ্রসর হতে প্রস্তুত নয়। সেক্ষেত্রে নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিমাণগত ও গুণগত সীমিতকরণকে এবং নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসারবোধকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তির জয় হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই কর্মপন্থার সমর্থনে চলছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পরপর অনেকগুলি ব্যবস্থা রচনা করে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর বিবেচনার জন্য পেশ করেছে, এগুলি রূপায়িত হলে শুধু নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদাশংকা হ্রাস করা নয় পরন্তু সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা করবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদাশংকা ক্রমশ অপসারিত করা সম্ভব হবে।

সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯২২ সনে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন জেনোয়া সম্মেলনে একটি সর্বজনীন অস্ত্র হ্রাস কর্মসূচী দাখিল করেছিল।

১৯৬২ সনে সোভিরেত ইউনিয়ন দাখিল করেছিল উপরে উল্লেখিত সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত চুক্তির খসড়া—এই বিস্তারিত দলিলটিতে পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে তিনটি স্তরে সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

প্রথম স্তরটিতে সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রেরণ ব্যবস্থা বিনষ্ট করবার, অন্যান্য জাতির ভূখণ্ডে সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটি ভেঙ্গে ফেলবার, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা তথা প্রচলিত অস্ত্র ও সামরিক ব্যয় আমূল কমাবার কথা ভাবা হয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তরে সমস্ত নিউক্লিয়র, রাসায়নিক ও জীবাণুঘটিত অস্ত্রের ভাণ্ডার বিনষ্ট করবার এবং এগুলির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবার, সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, সামরিক ব্যয় ও অস্ত্রশস্ত্র আরও কমাবার কথা বলা হয়েছিল।

তৃতীয় স্তরে সব দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও সামরিক অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করবার কাজ শেষ করবার কথা বলা হয়েছিল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৬২ সনের সোভিয়েত উদ্যোগের মধ্যে ছিল এমন অনেকগুলি সমস্যা সমাধান করবার নানা উপায়, যে সমস্যাগুলি এখনও মনুষ্য-জাতির উৎকণ্ঠার কারণ হিসাবে রয়ে গেছে। পশ্চিমের বাধা সৃষ্টিকারী মনোভাবই বস্তুত ষাটের দশকের মাঝামাঝি এই কর্মসূচীটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে দেয়নি।

১৯৪৬ সনে, যখন পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং হিরোসিমা ও নাগাসাকির ট্রাজেডি থেকে সবে সেরে উঠছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘের পরমাণু শক্তি কমিশনের বিবেচনার জন্য একটি চুক্তির খসড়া পেশ করেছিল, এই চুক্তিতে পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং এই মর্মে সংস্থান ছিল যে চুক্তিটি বলবৎ হবার তিন মাসের মধ্যে সমস্ত পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করতে হবে। তারপর থেকে সোভিরেত ইউনিয়ন নিউক্লিয়র অস্ত্রের প্রবক্তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অব্যাহতভাবে এই সমস্যাটির সমাধান চেয়ে এসেছে।

নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা। নিউক্লিয়র অস্ত্রের দ্রুত গুণগত উন্নতিসাধন নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষার উপরে সম্পূর্ণ ও সর্বজনীন নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়াকে অবশ্য করণীয় করে তুলছে।

১৯৫৫ সনে সোভিয়েত প্রস্তাব করেছিল যে নিউক্লিয়র অস্ত্রধর সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিউক্লিয়র পরীক্ষা বন্ধ করবার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করুক। কয়েক বছর ধরে চলবার পরও সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে আলাপ আলোচনা পশ্চিমের বিরোধিতার কারণে কোন ঐকমত্য এনে দিতে পারেনি বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করেছিল। আবহমণ্ডল, বহির্মহাকাশ ও জলতলে নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬৩ সনে। আজকে একশোটির বেশি দেশ এই চুক্তির অংশভাক্।

বর্তমান এই এলাকায় সাফল্যের সম্ভাবনা ঐ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও সুদূর বলে মনে হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে স্বাক্ষরিত দুটি সোভিয়েত মার্কিন চুক্তিতে ১৯৭৪ সনের ভূগর্ভে নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি

এবং ১৯৭৬ সনের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ভূগর্ভে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ সম্পর্কিত চুক্তি—এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত অনুমোদন দান করেনি। ১৯৮০ সনে পশ্চিম নিউক্লিয়র পরীক্ষার সম্পূর্ণ ও সর্বজনীন নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে ১৯৭৭ সনে শুরু হওয়া আলাপ আলোচনা এক-তরফাভাবে ভেঙ্গে দেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৮৫, ৬ আগস্ট থেকে যেকোন প্রকার নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের উপরে একতরফা স্থগিতাদেশ কায়েম করে একটি নতুন বড় উদ্যোগ উপস্থাপন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবচেভের বিবৃতিতে বলা হয়েছিল: "আমাদের স্থগিতাদেশ ১৯৮৬, ১ জানুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ চালানো থেকে বিরত থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ কার্যকরী থাকবে।"

রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সীমিতকরণ নিউক্লিয়র যুদ্ধের বিপদাশঙ্কা হ্রাস করবার সংগ্রামে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। সহজ-সম্পর্কের কালপর্বে ১৯৭২ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি বড় ধরনের চুক্তিতে—ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা বিরোধী (এবিএম) চুক্তি এবং রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণের ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যবস্থা সম্পর্কিত অন্তর্বর্তী চুক্তি (সল্ট-১)—স্বাক্ষর দান করেছিল।

ঐ প্রক্রিয়ার পরবর্তী বিবর্তনটির কথা সুবিদিত। ঐ দুটি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর একটি অনুগামী চুক্তি যেটিতে থাকবে আরও বিশদ ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থাদি—বিশদায়নের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। অনেক বছর ধরে আলাপ আলোচনার পর ১৯৭৯ সনে রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি (সল্ট-২) স্বাক্ষরিত হয়। এতে দুই পক্ষের নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রেরণার ব্যবস্থার উপরে সমান সর্বোচ্চ সীমা স্থির করে দেওয়া হয় এবং বিদ্যমান নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাস করবার ও এগুলির গুণগত উন্নতি-সাধন ও নবায়নের উপরে বিধিনিষেধ স্থাপনের সংস্থান রাখা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো পর্যন্ত ঐ চুক্তিতে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি। অধিকন্তু, সে ইওরোপে তার পের্শিং-২ ও ক্রুইজ ক্ষেপণাস্ত্র বসাতে শুরু করেছে এবং এইভাবে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ সন পর্যন্ত ইওরোপে মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্র সীমিত করবার জন্য জেনিভায় যে আলাপ আলোচনা চলছিল তাকে এবং রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হ্রাস ও সীমিতকরণ সম্পর্কিত আলোচনাকে (১৯৮২-৮৩) বানচাল করে দিয়েছে।

এই কারণে নিউক্লিয়র ও মহাকাশভিত্তিক অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নগুলির গোটা

পরিসর নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্য সোভিয়েত উদ্যোগকে বিশ্ব জনমত স্বাগত জানিয়েছিল। ঐ উদ্যোগের দরুন **বহির্মহাকাশের অ-সামরিকীকরণ এবং রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ও মাঝারি পাল্লার নিউক্লিয়র অস্ত্র হ্রাসকে অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণ নতুন কেতার আলাপ আলোচনা শুরু করা সম্বন্ধে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছিল।**

প্রথম দফার আলাপ আলোচনার ফল কী হয়েছিল? একে সন্তোষজনক বলা প্রায় অসম্ভব। বাস্তব সমাধান সন্ধান করতে প্রস্তুত একথা জোর দিয়ে বলে সোভিয়েত পক্ষ আলাপ আলোচনার সবগুলি দিক সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করেছিল। অপর পক্ষে, মার্কিন অবস্থান কোন দিক থেকেই রচনাত্মক ছিল না, এবং বস্তুত তা চুক্তির মর্মের পরিপন্থী ছিল।

নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ আন্তর্জাতিক জীবনের একটি প্রধান উপাদান। নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধের যে-ব্যবস্থা বর্তমানে বিদ্যমান তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রের বহু বছরের প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৬৮ সনে স্বাক্ষরিত এবং ১৯৭০ সনে বলবৎ হওয়া নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তি এর ভিত্তি। বর্তমানে ১২০টির বেশি দেশ এই চুক্তির শরিক।

এই চুক্তি মোতাবেক নিউক্লিয়র অস্ত্রধর রাষ্ট্রশক্তিগুলি কাউকেই নিউক্লিয়র অস্ত্র বা অন্যবিধ নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ কৌশল স্থানান্তরিত না করবার এবং নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলি নিউক্লিয়র অস্ত্র বা অন্যবিধ নিউক্লিয়র কৌশল তৈরি বা সংগ্রহ না করবার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি এজেন্সি (আই এ ই এ) নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলির নিউক্লিয়র কর্মকলাপের উপরে এবং গুদামজাত নিউক্লিয়র উপকরণগুলির উপরে নিয়ন্ত্রনভার গ্রহণ করেছে।

আজকে, নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার সমস্যা বিশেষভাবে জরুরী হয়ে উঠেছে। এর কারণ, সত্তরের দশকে, যে-দশকটি বিশ্ব-জুড়ে পরমাণু শক্তি প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের দ্বারা চিহ্নিত ছিল, অর্জিত বৈজ্ঞানিক প্রাযুক্তিক প্রগতির ভিত্তিতে নিজেদের নিউক্লিয়র অস্ত্র উৎপাদনে সমর্থ "প্রায় নিউক্লিয়র অস্ত্রধর" দেশগুলির সংখ্যা প্রচণ্ডরূপে বেড়ে গিয়েছিল। ইজরায়েলের, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার নিউক্লিয়র উচ্চাভিলাষ বিশ্ব জুড়ে বিশেষ উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনগুলি বারবার এই দেশ-গুলির নিন্দা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দেশগুলিকে যে রাজনৈতিক সমর্থন ও ব্যাপক বৈষয়িক সাহায্য দান করছে তা অন্যান্য দেশকে আতঙ্কিত করতে বাধ্য।

নিউক্লিয়র অস্ত্র পরীক্ষা সামূহিক ও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা, সবগুলি দেশ—কর্তৃক গুণগতভাবে সমস্ত নিউক্লিয়র অস্ত্র হিমায়িত করা এবং নিউক্লিয়র অস্ত্রশালা হ্রাস করা সম্বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছান অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে।

আরও অধিক সংখ্যক দেশ অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তির শরিক হলেও এ শক্তিশালী হতে পারে। চীন ও ফ্রান্স এই দুটি নিউক্লিয়র অস্ত্রধর দেশ এবং প্রায় দশটি "প্রায় নিউক্লিয়র অস্ত্রধর" দেশ এখনো এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেনি।

নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থার শক্তি-বৃদ্ধির জন্য দরকার সকল জাতির এবং নিউক্লিয়র অস্ত্রধর ও নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন সবগুলি রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। এই ঘটনাটির প্রতি আমরা চোখ বুঁজে থাকতে পারি না যে পৃথিবীতে এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু মহল রয়েছে যারা তাদের প্রতিবেশীদের ভয় দেখাবার জন্য নিউক্লিয়র অস্ত্র সংগ্রহ করতে চাইছে। পরমাণু শক্তি আজ গোটা মনুষ্যজাতির নাগালের মধ্যে, এ যেন বিভিন্ন দেশ ও জাতির সামাজিক প্রগতি, শান্তিপূর্ণ বিকাশের এবং তাদের সামনে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আনুকূল্য করে।

নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন দেশগুলির নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি শক্তিশালী করা। নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে যেসব দেশ স্বেচ্ছায় নিউক্লিয়র অস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ পরিহার করছে তারা তাদের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহৃত হবে না এই মর্মে পর্যাপ্ত গ্যারাণ্টি পাবে কিনা তার উপরে। নিউক্লিয়র অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তির শরিক নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি আন্তর্জাতিক দলিল রয়েছে।

১৯৬৮ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকার রাষ্ট্র-সংঘ সাধারণ পরিষদে একটি বিশেষ বিবৃতি দাখিল করে; এতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে এই তিনটি নিউক্লিয়র অস্ত্রধর রাষ্ট্র পুনরায় ঘোষণা করে যে তারা চাইছে নিরাপত্তা পরিষদ অস্ত্র প্রসাররোধ চুক্তির শরিক সেই নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন রাষ্ট্রের সমর্থনে যেন চটপট কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে যে আক্রমনের শিকার নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করে আগ্রাসনের হুমকির শিকার হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের তিন স্থায়ী সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ এই পদক্ষেপটি একাধিক এমন নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন দেশের আশঙ্কা দূর করতে পারেনি যারা তাদের এই প্রস্তাবকে আকড়ে ছিল যে নিউক্লিয়র অস্ত্রধর শক্তিগুলিকে এইসব দেশের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার না করবার বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭৮ সনে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র সংঘের নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত প্রথম বিশেষ অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন দেশগুলির ইচ্ছায় সাড়া দিয়ে ঘোষণা

করেছিল যে সে কখনোই সেইসব নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন দেশের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার করবে না যারা নিউক্লিয়র অস্ত্র উৎপাদন ও সংগ্রহ পরিহার করেছে এবং যাদের ভূখণ্ডে এরকম অস্ত্র নেই। একই বছর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের ৩৩-তম অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে নিউক্লিয়র অস্ত্রহীন দেশগুলির নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি শক্তিশালী করা সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা হোক। রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সদস্য-দেশ এই প্রস্তাবকে সোৎসাহ সমর্থন জানায় ; এতৎ সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন রচনা ও দাখিল করে, একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির বয়ানের খসড়া রচনার জন্য এটিকে রাষ্ট্রসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিটির (বর্তমানে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন) কাছে পাঠানো হয়। মুখ্যত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির নেতিবাচক মনোভাবের দরুন প্রশ্নটি এখনো পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে।

নিউক্লিয়র অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল ও শান্তির অঞ্চল প্রতিষ্ঠা নিউক্লিয়র বিপদাশঙ্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অপর প্রধান এলাকা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার কতিপয় মিত্রদেশ সেই পঞ্চাশের দশকে প্রথম এই নিউক্লিয়র অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা হাজির করতে শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে—মধ্য ইওরোপ, বলকান, উত্তর ইওরোপ ও অন্য কয়েকটি এলাকায়—নিউক্লিয়র অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সমর্থন জানায়। *এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রশক্তিগুলি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অতিমাত্রায় নেতিবাচক মনোভাব নিয়েছে।*

নিউক্লিয়র অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সোভিয়েত মনোভাব পুনর্ব্যক্ত হয়েছিল ১৯৭৮ সনে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসংঘে সেইসব রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে নিউক্লিয়র অস্ত্র মোতায়েন না করা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করে যেসব রাষ্ট্রে বর্তমানে কোন নিউক্লিয়র অস্ত্র নেই। স্মরণ করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ সদস্য-রাষ্ট্র প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছিল, এবং শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধতাই এই প্রস্তাবের রূপায়ণ ব্যাহত করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করবার সপক্ষে ছিল এবং এখনো রয়েছে। এই চিন্তাধারা এই অঞ্চলে সমস্ত বিদেশী সামরিক ঘাঁটি ভেঙে দেবার ও অঞ্চলের দেশগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করবার জন্য উপকূলবর্তী একাধিক দেশের কামনাকে প্রতিবিম্বিত করছে, এবং মার্কিন বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান সমর্থন লাভ করছে।

১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ সন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত মহাসাগরে সামরিক তৎপরতা সীমিত ও পরে হ্রাস করা সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ

আলোচনা চালিয়েছিল। যেহেতু এই আলাপ আলোচনা এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক পরিকল্পনাগুলির পরিপন্থী ছিল তাই ওয়াশিংটন একতরফাভাবে তা ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমরা আরও স্মরণ করতে পারি যে ভারত মহাসাগরকে শান্তির অঞ্চলে পরিণত করা সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সমস্যাদি সম্বন্ধে অসংখ্য সোভিয়েত উদ্যোগের তালিকা দিতে পারি। একমাত্র রাষ্ট্রসংঘেই সোভিয়েত ইউনিয়ন একশোটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছে। নৌ তৎপরতা সীমিতকরণ, রাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্র ও গণবিধ্বংসী নতুন নতুন অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, সামরিক বাজেট হ্রাস এবং এভাবে যে সহায় সম্পদ বাঁচবে তা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সাহায্য করবার জন্য ব্যবহারের লক্ষ্যাভিমুখী সোভিয়েত প্রয়াসগুলিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব ব্যবস্থাই এশিয়ার দেশগুলির ভবিষ্যতের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

দূর প্রাচ্যে আস্থা গড়ে তুলবার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট সবগুলি দেশের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠানের যে-প্রস্তাব সি পি এস ইউ-এর ২৬ তম কংগ্রেসে করা হয়েছিল সেটি এখনো সমান সময়োপযোগী রয়ে গেছে। রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদি রূপায়িত করতে আগ্রহী সমস্ত দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় ভিত্তিতে এরকম আলাপ আলোচনা চালাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত।

উত্তেজনার ক্ষেত্রগুলি নির্মূল করবার ও এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বিপজ্জনক পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করবার পথ সুগম করতে মস্কোর বাসনা সি পি এস ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গোরবাচেভ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত স্থায়ী সদস্য এই মহাদেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অ-হস্তক্ষেপ, বল প্রয়োগ না করা বা তার হুমকি না দেওয়ার নীতিগুলি কঠোরভাবে মেনে চলবার দায়িত্ব নিক এবং তারা এইসব দেশকে যেন সামরিক জোটে টেনে না আনে। এরকম দায়-দায়িত্ব নিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত।

এশিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নত করবার সমস্যার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব যে সিরিয়াস তা দেখতে পাওয়া যাবে সোভিয়েত-জাপানী সম্পর্কের প্রতি তার মনোভাবের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অনুমান থেকে অগ্রসর হয় যে কিছু কিছু প্রশ্নে দুটি দেশের মধ্যে বিদ্যমান মতপার্থক্য এই অঞ্চলে ও গোটা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাদের

অভিন্ন প্রয়াসে সহযোগিতাকে বাতিল করে দেয় না। সোভিয়েত-জাপানী আলোচনা পুনরায় শুরু করবার এবং সুপ্রতিবেশিত্ব ও পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে জাপানের সঙ্গে তার সম্পর্ক উন্নত করবার লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাধিক সুবিদিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেছে।

একটি সোভিয়েত-জাপান চুক্তি সম্পাদন—যে চুক্তিতে জাপানের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়র অস্ত্র ব্যবহার না করবার সোভিয়েত বাধ্যবাধকতা এবং জাপান কর্তৃক অ-নিউক্লিয়র মর্যাদা মেনে চলবার ও তার তিনটি "অ-নিউক্লিয়র" নীতি মেনে চলবার বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে—সম্বন্ধে মত বিনিময় করবার সোভিয়েত প্রস্তাবের জাপান এখনও জবাব দেয়নি। একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে এই প্রস্তাবটি আগের মতই সময়োপযোগী রয়েছে।

এশিয়ায় আন্তর্জাতিক বাতাবরণ উন্নত করবার লক্ষ্যে অন্যান্য দেশের রচনাত্মক উদ্যোগসমূহকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনিবার্যভাবে স্বাগত জানিয়েছে। এইসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কোরীয় উপদ্বীপ ও দূর প্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে কোরীয় গণতান্ত্রিক জনগণের প্রজাতন্ত্রের শান্তির উদ্যোগসমূহ এবং মঙ্গোলীয় গণ-প্রজাতন্ত্রের শান্তির প্রস্তাবগুলি, যেগুলি বিশ্ব জনমতের কাছ থেকে সদর্থক সাড়া পেয়েছে। এসব উদ্যোগ ও প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ না করা ও অনাগ্রাসন সম্বন্ধে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব এবং জাতিসমূহের শান্তিতে বাস করবার অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। মঙ্গোলিয়ার উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৯-তম অধিবেশন কর্তৃক গৃহীত এই ঘোষণায় শান্তি বজায় রাখা ও রক্ষা করাকে রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম মৌল কর্তব্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়াও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে যেগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের এবং এটিকে শান্তি ও স্থিতিশীলতার অঞ্চলে পরিণত করবার আবেদন জানানো হয়েছে। জোট-নিরপেক্ষ জাতিগুলিও বহু দরকারী ও রচনাত্মক চিন্তাধারা হাজির করেছে।

সংক্ষেপে, বর্তমানে আলোচনার টেবিলে রয়েছে এশিয়া সম্বন্ধে গোটা এক কেতা প্রস্তাব। ১৯৮৫, মে মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের সময় মিখাইল গোরবাচেভ আরও একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন: এইসব উদ্যোগকে তথা কিছুটা পরিমাণে ইওরোপের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনার মধ্যে নেওয়া এবং এশিয়ায় নিরাপত্তার সমস্যা সম্বন্ধে একটি সামূহিক, বিশদ দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করা এবং এই উদ্দেশ্যে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রয়াস একত্রিত করবার সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখা কি আবশ্যক নয়? অবশ্যই একাজটা সহজ হবে না,

কিন্তু হেলসিংকিতে ইওরোপীয় সম্মেলন ডাকাটাও সহজ ছিল না। এ কাজটা সম্ভবত হতে পারে নানা উপায়ে—দ্বিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার কিংবা যুক্ত রচনাত্মক সমাধান খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্যে একটা নিখিল-এশীয় সমাবেশের সম্ভাবনা সহ বহুপক্ষীয় কথাবার্তার মাধ্যমে।

এটা একেবারে স্পষ্ট যে এশিয়ার জাতিগুলির সংহতি ও কর্মের ঐক্য আগেকার যেকোন সময়ের চেয়ে আজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একটি অভিন্ন লক্ষ্যের অভিমুখে একযোগে কাজ করে তারা তাদের মহাদেশের উপরে নিউক্লিয়র বিপদাশঙ্কা এড়াতে এবং শান্তি ও প্রগতি অর্জন করতে পারে।
